ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও লোকছড়া

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও লোকছড়া

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি মূল্যবান শাখা হল ইতিহাস। নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলিতে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্য ইতিহাসের আকারে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত থাকলেও ইতিহাস শাখায় তা অনেকটাই প্রকট। ইতিহাসে ধারাবাহিকতা এবং পারম্পর্য রক্ষা করা হয় অনেক বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে। একথা ঠিক যে অনেকদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশ বা বাঙালি জাতি তার নিজের কোন ইতিহাস রচনার প্রতি আগ্রহ অনুভব করে নি। একটি জাতির অতীত ঐতিহ্যের লিখিত ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের কথা প্রথম জোরালোভাবে উচ্চারণ করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বলেছিলেন -"বাঙলার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালি তাহাকেই লিখিতে হইবে।..... আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।" (বঙ্গদর্শন)

ইতিহাসের আভিধানিক অর্থগুলি হল - পুরাবৃত্ত, প্রাচীন আখ্যান, ইতিবৃত্ত-অষ্টাদশ শাস্ত্রান্তর্গত শাস্ত্র, বৃত্তান্ত, ইতি-হ-অস (নিক্ষেপ করা)। মহাভারতের মতে, যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে তাহাই ইতিহাস। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর গোস্বামীর মতে ঋষি প্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান দেব ও ঋষির চরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্মকথাদি যাহাতে আছে তাহাই ইতিহাস।"[১] ইতিহাস কথাটির এই অর্থগুলি থেকেই একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে মানব সভ্যতা ও মানব সমাজ কত অঙ্গাঙ্গিভাবে অপর একটি ঐতিহাসিক বস্তুর সঙ্গে জড়িত যার নাম সংস্কৃতি।

ইতিহাস ও রাজনীতির মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য আন্তর্সম্পর্ক আছে। কারণ ইতিহাসই আমাদের জানায় আমাদের চারপাশে অথবা বৃহত্তর জগতে প্রতিদিন কি ঘটছে এবং ঘটে চলেছে। কিন্তু লোকছড়াগুলি কোন একজন নির্দিষ্ট মানুষের রচনা সাধারণত হয় না, অথবা নির্দিষ্ট কোন একটি মানুষের সমস্যা নিয়েও হয় না তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে অনেক পরীক্ষিত সত্যটিই লোকছড়ায় অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকে। আবার রাজনীতির ইতিহাস বলে লোকছড়ায় যেমন নির্দিষ্ট বিভাজন নেই, তেমনি মানুষের ব্যথা বেদনার ইতিহাস যা অবশ্যই রাজনীতির কারণ লোকছড়ায় তার প্রতিফলন ঘটেছে।

ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ, বা ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ থেকেই যে ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি তার যাত্রা শুরু করেছিল, ফোকলার পূর্ববর্তী অভিধা পপুলার অ্যান্টিকুইটিস থেকেই তা অনুমান করা যায়। সেই সময় লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম আগ্রহ ছিল অতীত অনুসন্ধান করা। তাই ইতিহাসের অনেক সংজ্ঞার মধ্যে একটি হল- "সমাজবন্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস।"[২]

লোকছড়াগুলি যারা রচনা করেছেন তাদের অবশ্য ইতিহাসবিদের দায় ছিল না। তাদের আগ্রহ ছিল ততটুকুই জানার যে সত্য তাদের জীবনের সাথে যুক্ত, যে সত্য তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করে নিজস্ব পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে যা অর্থহীন বলে মনে হয় তাই অর্থপূর্ণ করে তোলা যেতে পারে লোকছড়াগুলির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানে। লোকসংস্কৃতি চর্চায় এই পদ্ধতিটিরই নাম ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ।

লোকসংস্কৃতি এই শাখাটিকে এইভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের মান্যতার দিকে চেয়ে ১৮৯১ সালে জর্জ লরেন্স (লন্ডন ফোকলোর সোসাইটি) যে বইটি লিখেছিলেন তার নাম - Folklore as a historical science এ বিষয়ে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের অভিমতটি হল - "যদি জানা যায় যে এই সংস্কৃতি মানুষের হরেক সামাজিক ক্রিয়াকান্ড ও প্রক্রিয়ার একটি অভিব্যক্তি, যদি জানা যায় যুদ্ধযাত্রার কালে কিংবা সামাজিক ও নৈতিক উপদেশ ও নির্দেশ প্রচার ইত্যাদির জন্য কোন লোকসঙ্গীত বা কবিতা তৈরী হয়,

যদি জানা যায় যে, কোন আচার উৎসব নিয়ন্ত্রিত হয়, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও রাজনৈতিক আধিপত্যের আওতায় কিংবা যদি লোককথার কথাবস্তুতে ভূমি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তাহলে সমাজের গঠন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে আলাদা করা যায় না বোধ হয়। লোকসংস্কৃতির চর্চায় এ পর্যন্ত আমরা তাকে এক স্বতন্ত্র সত্তায়, স্ব-নির্ভর, স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ হিসাবে শুনতে পাইনি তার অন্তঃস্বর, দেখতে পাই নি তার প্রতিমা। এই দেখায় সামাজিক জীবনকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয় নি সত্য, কিন্তু সমাজ পরিবেশ বা রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ কতটা বা আদৌ আছে কিনা সেই হিসাব করা হয় নি। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে, সামাজিক দায় ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও কৌশলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আমাদের নজর এড়িয়েছে। আমরা খোঁজ নেই নি একটা প্রথা কেন বা কাদের নেতৃত্বে তৈরী হল, তাতে একটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন গোষ্ঠীর স্বার্থ লুকানো ছিল কিনা অথবা তেমন কোন স্বার্থই কোন লোক-উৎসব নিয়ন্ত্রণ করে কিনা । রাজস্বার্থে প্রতিপত্তি প্রসারের দায়ে কোন মিথ্ তৈরী হয় কিনা কিংবা যে প্রবাদকে আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, পথঘাটের প্রাজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন বলে মানি তার নেপথ্যেও কোন আধিপত্য বা নির্দেশ আছে কিনা।"[৩]

ইতিহাসবিদরাই ঘোষণা করেন যে "ইতিহাস এমনই একটা বস্তু যার সংজ্ঞা সম্পর্কে কোন মতৈক্য নেই।"[৪] মতৈক্য যখন নেই তখন একজন ঐতিহাসিকের পক্ষপাতিত্বেই বোধ হয় স্থির হবে তিনি কোন তথ্যের উপর গুরুত্ব দেবেন বা তিনি কোন ইতিহাস লিখবেন এই মানসিকতাই জন্ম দিচ্ছে ইতিহাসের নানা ব্যাখ্যার নানা পন্থার। তেমনি নানা সম্পর্কের সন্ধানী আধুনিক লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসাও অনেক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। লোক সংস্কৃতির এই অন্তর্সংলাপ ঐতিহাসিকদের সচেতন রাখে ইতিহাসের ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্ণয়ে।

লোকসংস্কৃতি চর্চা এবং অনুসন্ধিৎসায় ইতিহাসবিদদের আকর্ষণের অন্য আরেকটি কারণ হল নিম্নবর্গীয় ইতিহাস যা প্রায়শই অলিখিত থাকে। মূল প্রবাহের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস জানার একমাত্র উপায় হল সমাজে নানা উপায়ে বেঁচে থাকা মৌখিক ও প্রবাহিত ঐতিহ্য থেকে উপাদান খুঁজে নেওয়া। কালের ব্যবধানে ইতিহাস তার সত্যের রূপ পরিবর্তন করলেও একথাও ঠিক যে লোকছড়াগুলির মধ্যে ইতিহাস এমন সংহত অবস্থায় আছে যে তা প্রায় অপরিবর্তনীয়-ই বলা যায়। তার কারণ হল ছড়ার অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইতিহাসের কোন বর্ণনা, বিশ্লেষণ বা পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন নেই, ঘটে যাওয়া ঘটনা যাতে অধিকাংশ মানুষই প্রভাবিত হয়েছেন এমনই অনুভূতি সংহত এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সুস্থিত অবস্থায় থাকে।

ইতিহাসের যে অংশটি সবচাইতে প্রত্যক্ষ ও মানুষের জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা হল রাজনৈতিক ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকেই রাজনীতি কোন না কোনভাবে মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীটি নানার সংঘাতময় ও বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। একদিকে স্বাধীন সুলতানি আমল, অন্যদিকে ইংরেজ জাতির ভারতে ব্যবসা উপলক্ষে আগমন ও একটু একটু করে প্রথমে বাংলা ও পরে ভারতীয় শাসন ক্ষমতায় আধিপত্য বিস্তার রাজনৈতিক ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটেই বিভিন্ন লোকছড়াগুলি গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার ইতিহাসে চূর্ণ-বিচূর্ণগুলি এই লোকছড়াগুলিতে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে রয়েছে।

রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত সেই লোকছড়াগুলি হল ঃ-

১। সহর হইতে বাহির হইল নবাব সহর করে খালি
দিনে দিনে সোনার বরণ হয়ে গেল কালি।
মার লাগিল রে গিরিয়ার ময়দানে
কাঁদে বাঙ্গালার সুবা হাপুস নয়নে
পূর্বেতে করিল মানা নানা জাফর খাঁ
ভাল-মন্দ হইলে নবাব সহর ছেড় না।[৫]

মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে বর্তমান জঙ্গীপুরের উপবিভাগের কাছে একটি বিশাল প্রান্তর আছে, তার নাম গিরিয়া। এই প্রান্তর ভাগীরথী নদীর জলপ্রবাহ দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত, পশ্চিমতীরের স্থানটি সুতীর ময়দানে বলে চিহ্নিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গিরিয়ার প্রান্তরে দুইটি মহাযুদ্ধ হয়েছিল, যার পরিণামে বাংলার ইতিহাস নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিল। গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ নবাব সরফরাজ খাঁ ও আলিবর্দীর খাঁর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। শুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হয়েছিলেন (মার্চ, ১৭৩৯ খৃঃ)। সরফরাজ নবাব পদের অযোগ্য ছিলেন বলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয় তাতে যোগ দিয়েছিলেন সরফরাজের মন্ত্রী হাজি আহমেদ, জগৎ শেঠ, ফতে চাঁদ ও রায়রায়ান আলম। তারা বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করলেন। "আলীবর্দী পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে আসার পথে রাজমহল, ফরাক্কা ও পরে সুতীর কাছে ভাগীরথীর মোহনার নিকটস্থ শাহমোর্তাজার হিন্দির সমাধিস্থল থেকে জঙ্গীপুরের কাছে বালিঘাটা পর্যন্ত শিবির স্থাপন করে পিপিনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন (মার্চ,১৭৪০ খৃঃ)। অন্যদিকে সরফরাজ খান সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বর্তমান সুতীর নিকটে গিরিয়াতে পৌছিয়াছিলেন। ১৭৪০ খৃঃ ১০ই এপ্রিল গিরিয়াতে দুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। দুই তিন দিন পরে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ অধিকার করিলেন।"[৬]

নবাব হিসাবে সরফরাজ খাঁ যোগ্য ছিলেন না। তাঁর বিলাস-ব্যসনের কথাও ইতিহাস স্বীকৃত। কিন্তু তিনি নির্ভর করেছিলেন তাঁর বিশস্ত কর্মচারী হাজী আহমেদের উপর । তিনি নানা স্তোকবাক্যে সরফরাজকে সন্তুষ্ট করে মুর্শিদাবাদে অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিয়ে রেখেছিলেন এবং যথোপযুক্ত সৈন্য প্রস্তুতে বিলম্ব করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আলিবর্দী যখন পাটনা থেকে গিরিয়ার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলেন হাজী আহমদ সপরিবারে আলিবর্দীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল সরফরাজ খাঁ-এর শোচনীয় পরাজয়।

২। জলদি করে হুকুম দেবে নবাব জলদি করে
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সূতীর দরগাতে
সওয়া সের আটার মোয়া পোয়া ভর ঘি,
একা লয়ে গোয়াস খাঁ সকালের জী ।[৭]

আলিবর্দী খাঁর সঙ্গে বাঙলা দখলের এই লড়াই-এ সরফরাজ খাঁ তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণে মন্ত্রী হিসাবে যেমন হাজী আহমেদকে পেয়েছিলেন, তেমনি সৌভাগ্যবশত পেয়েছিলেন সেনাপতি গওস খাঁকে। এই যুদ্ধে নবাবের পাশে থাকাই শুধু নয় গিরিয়া যুদ্ধের আগে যুদ্ধ জয়লাভের আশায় প্রধান সেনাপতি ওই গওস খাঁ গিরিয়ার কাছে সুতীর নামক জায়গায় মূর্তজা ফকিরদের দরগায় জয়লাভ প্রার্থনা করে ফিরনি দিয়েছিলেন। কিন্তু গওস খাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও সরফরাজের পরাজয় আটকান যায় নি। এই প্রসঙ্গে ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত বলেন- The battle of Giria brought under alivardies but orissa, which for various reasons formed an important part of the bengal subah, still remained unsubdued.[৮]

৩। ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো পান পুরালো খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন ধন।। (রাজশাহী)[৯]

বর্গীদের অত্যাচারে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে এই ছড়াটি বৃহৎ বাঙলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অঞ্চল ভেদে ছড়াটির সঙ্গে সামান্য কিছু সংযোজন ও বিয়োজন হয়েছে মাত্র। দেশের সংকটকালের চিত্র প্রায়শই অভিব্যক্তি পায় সাহিত্যে। এই ছড়াটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত লৌকিক ছড়ার কাল নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এই ছড়াটি ১৭৪০ খৃঃ পর কয়েক বছরের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে সহজেই বোঝা যায়।

"সমসাময়িককালে লেখা যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামার উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্নদামঙ্গল অন্যতম। এছাড়া কোনো কোনো পুঁথির পুষ্পিকায় এবং কোনো কোনো চিঠিতে বর্গী আক্রমণের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক কিংবদন্তী। এছাড়া তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলিতে এই বর্গী আক্রমণই মূল প্রতিপাদ্য। একটি কাব্য ওড়িষ্যা ভাষায় লিখিত নাম 'সমরতরঙ্গ'। কবির নাম ব্রজনাথ বড়জেনা। রচনাকাল ১৭৪০ থেকে ১৭৪৮ এর মধ্যে। ওড়িষ্যা রাজ্যও যে বর্গীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছিল, তারই বিবরণ আছে কাব্যটিতে। দ্বিতীয় কাব্যটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি চম্পুকাব্য। অর্থাৎ কাব্য আকারে লিখিত হয়েও মাঝে মাঝে গদ্য বিবৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। কাব্যটির নাম চিত্রচম্পু, রচয়িতা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। অন্যটি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র' পুরাণ। সময় ১১৫৮ বঙ্গাব্দ। বর্গীর হাঙ্গামাই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু, কারণ পুঁথির শেষ পুষ্পিকায় স্পষ্টই লেখা আছে-'ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কান্ডে ভাস্কর পরাভব। শকাব্দ ১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল। গঙ্গারাম বর্গীর হাঙ্গামার যে চিত্র এঁকেছেন তা কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট না হলেও সত্যতা গুণে নির্ভরযোগ্য।"

এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া ।
চর্তুদিকে বর্গী বেড়ায় লুটিয়া ॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠ মোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাত্র জুতা চড়া॥
এই মত বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে ॥

বর্গীর হাঙ্গামার ফলে নারীদের অবস্থা হয়েছিল আরও শোচনীয়। নিঃসহায়, অসহায় হাওয়া ছাড়া শারীরিক ভাবেও যথেষ্ট অসম্মানিত হতেন নারীরা। গঙ্গারাম লিখেছেন -

ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইর‍্যা লইয়া জাএ ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলা এ ॥
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে ।
রমনের ভয়ে ত্রাহি শব্দ করে ॥
এই মতে বর্গী কত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে দেয় সব ছাইরা ॥

ভারতচন্দ্র তার অন্নদামঙ্গালে লিখেছেন -

লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল ।
গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জঞ্জাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি ।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউরী বহুড়ী ॥

এই অত্যাচারের ফলে কেবল যে সাধারণ মানুষই গ্রাম ছেড়ে পালাত তাই নয়, বর্ধমানে মহারাজা তিলক চাঁদের মা সপুত্রক নদীয়ার মহারাজার কাছ থেকে গঙ্গার তীরে মূলাজোড় ইজারা নিয়ে সেখানে কিছুকালে বাস করেন। স্বয়ং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে ইচ্ছামতী নদীর তীরে সাময়িক আবাস স্থাপন করলেন। মুর্শিদাবাদের ধনকুবের জগৎ শেঠের বাড়ী থেকে তিন লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হওয়ায় জগৎ শেঠ ধনরত্ন নিয়ে ঢাকায় চলে যান। অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিরা কলকাতায় ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে ঃ বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা বর্গী নামে পরিচিত ছিল। এই বর্গী শব্দটি বরগীর শব্দের অপভ্রংশ। মারাঠা বাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের সর্বনিম্ন পদাধিকারীদের বলা হোত বর্গী। ১৭৪২ সালে এপ্রিলের প্রথম দিকে মারাঠা বাহিনী আক্রমণ শুরু করে বর্ধমান থেকে তারপর একে একে মুর্শিদাবাদ হুগলি ক্রমে রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও যশোহর পর্যন্ত গঙ্গার পূর্বাঞ্চলও তাদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

ইতিহাস বিখ্যাত এই বর্গীর আক্রমণের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন নাগপুরের মার্হাটা রাজা রঘুজী ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পন্ডিত। এই ভাস্কর পন্ডিত তথা মারাঠাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা থেকে বাঙলাকে পরিত্রাণ এবং বাঙলা থেকে মারাঠাদের বিতাড়নের লক্ষ্যে নবাব আলিবর্দী খান বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতার কৌশল অবলম্বন করেন। বাঙলার চৌথ কর প্রদানের বিষয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সমঝোতায় উপনীত হতে ভাস্কর পন্ডিত এবং তার সহযোগীদের একটি বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানান। ১৭৪৪ সালের ৩১শে মার্চ মানকাড়া নামক স্থানে এক বিশাল তাবুতে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ২১ জন সহযোগী সহ ভাস্কর পন্ডিত তাবুতে উপস্থিত হলে তাবুর পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঘাতক দল তাঁকে হত্যা করে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বাংলা ও ওড়িষ্যা থেকে সকল মারাঠা ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলা হয়। এই ঘটনার পর বিহার, ওড়িষ্যা ও বাঙলায় প্রায় ১৫ মাস শান্তিশৃঙ্খলা বজায় ছিল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বেঁচেছিল বাঙলার মানুষ। এরপর থেকে যে কোন বিপর্যয়ের, দুশ্চিন্তার, উদ্বেগের অবসান বোঝাতে ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বাক্যটি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে? ঃ আলিবর্দীর কৌশলে বর্গী নেতা ভাস্কর পন্ডিত মারা গেলেও তার মিলিত বাহিনীর দীর্ঘদিনের অত্যাচারের প্রক্রিয়া বাঙলাকে শ্মশানের চেহারায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল। অত্যাচারের এই চিত্রটি অনুধাবন করাতে ছড়াকায় ব্যবহার করেছেন এই শব্দগুলি।

'বুলবুলি' বাঙলার এক অতি পরিচিত পাখি। বুলবুলি পাখি নামের আড়ালে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটিকেই বোঝান হয়েছে। বুলবুলি - যার হিন্দী নাম পাহাড়ী বুলাল চশম আর বাংলায় 'সাত সয়ানী' বা লাল বুলবুল। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বুলবুলিদের গায়ের রঙ পিঠের উপরের দিকে উজ্জ্বল চকচকে কালো, নিচের দিকটা কমলা লাল, গাঢ় লালে মেশানো। এইসব পাখির পুরুষ প্রজাতিরা একসঙ্গে ৩০/৪০টি ঝাঁক বেঁধে থাকে। এই দলে তারা স্ত্রী ও শিশুদের নেয় না, তারা আলাদা দলে থাকে। সদলবলে যখন এই পাখিগুলি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে যায় তখন এক সাথে হু-টুইট বা হুই রি রি আওয়াজে ডাকতে থাকে। এই পাখিরা বেশ লড়াকু মেজাজের, আবার একই সঙ্গে শিকার ধরার ব্যাপারে কৌশলীও বটে। প্রথম বর্ষার পর যখন ডানা গজানো পোকারা মাটির বাসা ছেড়ে উড়তে আরম্ভ করে তখন এই বুলবুলিরা ঝোঁপের মাথা থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উড়ে উড়ে প্রচুর উইপোকা খেয়ে শেষ করে দেয়। ভারতে যারা পাখির কদর করেন তারা এই পাখিগুলিকে লড়ুয়ে বুলবুল বলে বেশ খাতির করে থাকেন। দেশের অনেক অঞ্চলেই বিশেষ পর্বের দিনে বুলবুলের লড়াই উৎসবের এক বিশেষ অঙ্গ। "বাংলাদেশের এই বুলবুল পাখি একটি প্রজাতিকে সিপাহী বুলবুলও বলা হয়। কালো কুচকুচে গলার কাছে এবং পেছনের দিকে লাল রং এই পাখির আছে।"[৮]

শোনা যায় মারাঠা বর্গীরাও এইরকম কালো পোষাক মাথায় লাল ফিতে বেঁধে ত্রিশ/চল্লিশ জনের এক লড়াকু দল মুখে হর হর মহাদেব ধ্বনি তুলে অতর্কিতে গ্রামবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। দীর্ঘদিনের এক নির্দিষ্ট সময় সীমায় এই অত্যাচার গ্রামবাসীকে করেছিল নিঃস্ব, আর ক্ষেতের পর ক্ষেত লুণ্ঠন করে জ্বালিয়ে দিয়ে তার উর্বর শক্তিকেও করেছিল বিনষ্ট। এক সার্বিক হাহাকারের চিত্র এই বাক্যটিতে প্রতিফলিত। কারণ সর্বস্বান্ত গ্রামবাসীর কাছে তখন খাজনা প্রদান করা মৃত্যুরই সামিল ছিল।

ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি ঃ বাঙলার কৃষক এবং বাঙালির কাছে ধান জীবনধারণের এক এবং অন্যতম প্রতীক। তাঁর সংস্কৃতির পরিচয়ও বটে। আর খাদ্য হিসাবে পান এর অবস্থান ক্ষুন্নিবৃত্তির ততটা নয়, যতটা পরিতৃপ্তির। যে কোন শুভকার্যে মঙ্গাল প্রতীক পান বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম নির্ণায়ক। অন্যভাবে বলা যায় খাদ্যের শুরু ধানজাত সামগ্রীর মাধ্যমে আর শেষ 'পান' নামক খাদ্যবস্তুর রসালো জারক রসে। বর্গী হাঙ্গামা পরবর্তী কৃষকেরা কতখানি নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল তার অন্তিম অবস্থা বোঝাতে এই শব্দ দুটি ব্যবহার হয়েছে। যদিও ছড়ার দাবি অনুযায়ী শব্দ দুটি কেবল ধনাত্মক আবহ তৈরীর কারণে এসেছে বলে মনে হতে পারে।

বাঙলার এই দুঃসময়ে চাষীরা কতরকমভাবে নিপীড়িত হতো ইতিহাসে তার বিবরণ পাওয়া যায়। সুবে বাংলায় তখন ভূমি রাজস্বই ছিল জমিদার সুলতানদের আয়ের অন্যতম উৎস। তিন ধরনের জমি ছিল। প্রথম- খালিসা শরিফা অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন, দ্বিতীয়- কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গীর, তৃতীয়- প্রাচীন জমিদার অথবা সামন্ত রাজার জমি। এই তিন প্রকার জমি থেকেই যথেষ্ট অত্যাচারের সঙ্গে রাজস্ব আদায় করা হোত। খাজনা আদায়ে অত্যাচার ছিল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ১৭১৭ খৃঃ মুর্শিদকুলী খান বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হলে রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিলেন। মুর্শিদকুলী খানের পূর্ববতী নবাব আজিমুসসান (১৬৯৭-১৭১২ খৃঃ) এর আমলে আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা। এর সঙ্গে মুর্শিদকুলীর অতিরিক্ত কর(আবওয়াব) বাবদ আদায় করতেন ১৯,১৪,০৯৫ টাকা। পরবর্ত্তী নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলেই বর্গীর হাঙ্গামা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। বর্গীর এই হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য ১৭৪০ খৃঃ ৩০শে মার্চ আলিবর্দী ও পেশোয়া বালাজী রাওয়ের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দেবেন এবং বালাজীকে তার সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন। আর এই অর্থের সবটাই সংগ্রহ করা হোত প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে। উপর্যুপরি এই শোষণ এবং তদুপরি বর্গী হাঙ্গামার অমানুষিক অত্যাচার বাঙলাদেশে মহাবিপর্যয় ডেকে আনে। দলে দলে বাঙালিরা ঘরবাড়ি ছেড়ে গঙ্গার পূর্বদিকের জেলাগুলিতে পালিয়ে যায়। এতে উক্ত এলাকায় জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট তৈরী করে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হল অজন্মা ও খরা। ফলে বহু কৃষক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলেন, যারা বেঁচে রইলেন তাদের অবস্থা হল অবর্ণনীয়। 'খাজনার উপায় কি' - কথাটি তাই সুদূর ব্যঞ্জনাবহ।

আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি -ঃ শুধু বাংলার কৃষকরা বা সাধারণ মানুষই নয়, স্বয়ং নবাব এবং নবাবী সৈন্যরাও এই সার্বিক বিপর্যয়ের সমান শিকার হয়েছিলেন। 'সবুর কর রসুন বুনেছি'-র সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় খাদ্যজনিত চাহিদার যথোচিত জোগান না দিতে পারায় অহেতুক যুক্তি। এখানে 'রসুন' অর্থে কেবল 'রসুন' সব্জীটাকেই বোঝাচ্ছে না, ব্যাপক অর্থে সামগ্রিক খাদ্যাভাবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। গঙ্গারাম তাঁর 'মহারাষ্ট্র পুরাণের' বিবরণে বলেছেন - বর্গীদের ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে যেত না, কোথাও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত না। নবাবী সৈন্যরা এমন কি স্বয়ং নবাব পর্যন্ত কলাগাছের মূল সিদ্ধ করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। বর্ধমান থেকে কাটোয়া যাবার পথে নবাবী সৈন্যরা তিনদিন প্রায় উপবাসে কাটিয়ে ছিলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখছেন- Alibardi found himself encircled by the myriads of Decean light horse. The Nawals position was very eritical as he had only three thousand horse man and a thousand more foot musketeers with him but was incumbered with all his baggage, camp followers and family, the main postion of his army having been barlier sent back to his

capital. He was forced to halt a week in, Bardwan. The Marathas cut off his grain supply, one party of them under Bhaskar pandit keeping up the investment and anther party plundering the country for forty miles around[১] গঙ্গারামও বর্ণনা দিয়েছেন - বর্গীরা নবাবের শিবির চর্তুদিক থেকে ঘিরে রসদ যাওয়া আসার পথ বন্ধ করে দিল। চাল, তেল, আটা, চিনি, লবণ, কলাই, মটর কিছুই পাওয়া যেত না। সৈনিকরা পেত না গাজা, ভাং তামাক। কাজেই -

ছোট বড় লঙ্কার যত লোক ছিল,
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল
বিসম বিপত্য বড় বিপরীত হইল।
অন্যে পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল। (মহারাষ্ট্র পুরাণ)

ঐতিহাসিক সলিমুল্লা এবং গোলাম হোসেন সেলিম তারাও এই সত্য স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক ইউসুফ আলি এক সেরেরও কম ওজনের খিচুড়ী সংগ্রহ করে অন্য সাতজনের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের খাদ্য ছিল কলাগাছের মূল ও ঘাস। শস্যশ্যামলা বর্ধমান জেলা সহ সমগ্র বাঙলার চিত্রটাই ছিল এইরকম। 'রসুন' খাদ্য হিসাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় কিন্তু উপাদেয় খাদ্যে তৈরীর অন্যতম উপাাদন। চরম খাদ্য সংকটের দিনে উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন এই বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা বোঝাতেও উক্ত বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

চব্বিশ পরগণা জেলাতে এই ছড়াটি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে 'খোকা'র জায়গায় 'ছেলে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে ঃ এই পরিবর্তনের ইতিহাসটি এইরকম - আলিবর্দীর কৌশলে মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পন্ডিত মারা যাবার পর বাংলাদেশে কিছুদিন শান্তি বিরাজ করেছিল কিন্তু এই আপাত শান্তির অন্তরালেই মীর হাবিব-এর নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী পুনরায় সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে ওড়িষ্যায় বীর হাবিব তার আধিপত্য বিস্তার করেন। মীর হাবিবের কবল থেকে ওড়িষ্যা পুনর্দখলের জন্যে আলিবর্দী ১৭৪৬ সালের শেষের দিকে ওড়িষ্যা অভিযান করেন। আলিবর্দীর সেনাপতি মীরজাফর মীর হাবিবের সেনাধ্যক্ষ সইয়াদ নুরকে মেদিনীপুর শহরের কাছে যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু তারপর রঘুজী ভোঁসলের পুত্র জান্দোজী ভোঁসলে বালাশোরের দক্ষিণ দিক থেকে আগত মীর হাবিবের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র মীরজাফর মেদিনীপুর জেলা ছেড়ে দিয়ে বর্ধমানে চলে আসে। ১৭৪৭ সালের এক প্রচন্ড যুদ্ধে আলিবর্দী জানোজীকে পরাজিত করেন। পরাজিত মারাঠা হানাদারেরা মেদিনীপুর পালিয়ে গেলে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা হানাদার মুক্ত হয়। নবাব তার রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং বর্ষাকালটা সেখানেই কাটান। ১৭৪৮ সালের পুরো বছরটিতে মারাঠারা সম্পূর্ণ উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ১৭৪৯ সালের মার্চ মাসে আলিবর্দী উড়িষ্যা পুনর্দখলে যাত্রা করেন। কয়েকটি খন্ডযুদ্ধের পরই মারাঠা পিছু হটতে থাকে। ১৭৪৯ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি নবাব আলিবর্দী উড়িষ্যা পুনর্দখল করেন। কিন্তু উড়িষ্যা দখলের পর কটক থেকে ফিরে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মীর হাবিবের নেতৃত্বে মারাঠাবাহিনী আলিবর্দীর প্রতিনিধিকে পরাজিত ও বন্দী করে । বৃদ্ধ ও রণক্লান্ত আলিবর্দী উড়িষ্যা থেকে মারাঠাদের বাঙলা গমনের পথরোধ করতে মেদিনীপুর ফিরে আসেন।

১৭৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে মারাঠা বর্গীরা পুনরায় বাঙলায় হানা দিতে শুরু করে। ঐ বছর ৬ই মার্চ হাবিব মুর্শিদাবাদের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুঠপাট করেন। আলিবর্দী আবার মেদিনীপুর থেকে বর্ধমানে সরে আসেন। হানাদার মারাঠারা জঙ্গলে পালিয়ে গেলে এপ্রিল মাসে আলিবর্দী সীমান্ত ঘাঁটি মেদিনীপুর রক্ষার জন্য ফিরে আসেন। উড়িষ্যা থেকে অবরোধ শুরু করে এতদিনের লড়াই থেকে মারাঠা নেতা মীর হাবিব তেমনভাবে লাভবান হতে পারেনি। বরঞ্চ তার বাঙলা অভিযানগুলি আলিবর্দীর সর্তকতা ঔ দৃঢ়তার কারণে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এসব বিবেচনা করে মীর হাবিব

আলিবর্দীর সাথে এক শান্তি চুক্তির আলোচনায় রাজী হন চুক্তির শর্তানুসারে মীর হাবিব নবাবের কর্মকর্তা হিসাবে পদাধিকারী হবেন এবং উড়িশ্যায় নবাবের নাজিম বা ডেপুটি গর্ভণরের দায়িত্ব পালন করবেন। আলিবর্দী মীর হাবিবের জন্য উড়িষ্যায় ১২ লক্ষ টাকা চৌথ পাঠাবেন। এই চুক্তিতে আরও বলা হল ভবিষ্যতে আর কখনও যেন আলিবর্দীর এলাকায় হানাদার মারাঠাদের পদার্পণ না ঘটে। মীর হাবিব এই সব কটি শর্তই মেনে নেন। কিন্তু মারাঠা বাহিনীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে চুক্তির শর্তগুলি অপমানজনক বলে মনে হল। ফলে ১৭৫২ সালের ২৪শে আগষ্ট মারাঠা সৈন্যের হাতে চুক্তির অন্যতম নেতা মীর হাবিব নিহত হন। এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রচলিত ছড়াটিতে 'ছেলে ঘুমানোর পরিবর্তে খোকা ঘুমাল' কথাটি এসেছে। "সাধারণভাবে ছেলে মুসলমান পরিবারে এবং 'খোকা' হিন্দু পরিবারে বলা হয়। পূর্বের ছড়াটি রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত, মুর্শিদাবাদ ছিল অখন্ড বাংলাদেশের রাজশাহীর পাশাপাশি জেলা। আলিবর্দীর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। যুদ্ধ বিগ্রহ এখান থেকেই পরিচালিত হোত। তাই অনুমান ছড়াটির জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ হওয়াই স্বাভাবিক"।[১০] ভাস্কর পন্ডিত এবং মীর হাবিব জেলা ভেদে 'ছেলে' এবং খোকায় পরিণত হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায় এই ছড়াটি আবার সামান্য পরিবর্তিত হয়ে প্রচলিত রয়েছে। ছড়াটি এইরকম -

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়ালো গরকী আইল দেশে।
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে। (চট্টগ্রাম)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসকে 'গরকী' বলা হয়। সমুদ্রতীরস্থ সাধারণ মানুষেরা মাঝেমধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত এই ঝড়ে। এই অঞ্চলের মানুষ বর্গীদের সাথে পরিচিত ছিল না। সামূহিক বিপদ বলতে তারা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই বুঝত। আর 'মণি' অর্থে আদরের সন্তান তা ছেলে অথবা মেয়ে হতে পারে, মণি অথবা মনু বলেই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অভিহিত হোত তখন।

মণি ঘুমালো কথার নেপথ্যে রয়েছে বাঙলার আর এক দুর্দশার ইতিহাস 'বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিত। এমন কোন অপকর্ম নেই যা তারা করতে পারত না। তারা নামেই খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু তাদের মত জঘন্য পিশাচ প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেত না। খুনজখম, ধর্ষণ, লুঠতরাজ ইত্যাদির ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে, মোগলদের ভয়ে সবসময় তিনি সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং যুদ্ধ- বিগ্রহ আশঙ্কা করে এই ফিরিঙ্গি দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পর্তুগীজরাও রাজার এই উদ্দেশ্যের কথা জানত, তাই এই প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে তারা রীতিমতো যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করল। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুঠতরাজ, অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল। শুধু তাই নয়, গঙ্গার অসংখ্য শাখানদী দিয়ে ভিতরে ঢুকে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে তারা লুঠতরাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। হাটবাজারের দিনে গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের লোকদের তারা ক্রীতদাস আর মেয়েদের বাঁদী করে নিয়ে যেত। শোনা যায়, হাতের তালু ফুটো করে বেতের কঞ্চি ঢুকিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজনকে আটকে অনেক মেয়েকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলত। নৌকোর পাটাতনের নীচে তাদের থাকতে হত দিনের পর দিন, খাদ্য হিসাবে ছিল কয়েক মুঠো ছিটিয়ে দেওয়া চাল। উৎসব- পার্বণের দিনেও তারা এইভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। নিম্নবঙ্গের কত গ্রাম এইভাবে যে তারা লুন্ঠন করেছে এবং অত্যাচার করে জনশূন্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই।'[১১] বাংলাদেশে সুবাদার হয়ে এসে শায়েস্তা খাঁ যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন তা হল এই মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন। 'মণি' শব্দের মধ্যে দিয়ে তাদের আদরের সন্তানের ছেলে অথবা মেয়ে অপহরণ অথবা বিনষ্টিকরণের স্মৃতি থাকতে পারে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের ওলটপালট বা গোলমাল হয়ে যাওয়ার অর্থেই বুলবুলির জায়গায় গুলগুলিয়ে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আল দ্যাশে
টিয়ায় ধান খাইলে খাজনা দেবো কিসে। (পাবনা)

পাবনা জেলায় প্রাপ্ত ছড়াটিতে বুলবুলির জায়গায় পরিবর্তিত শব্দ টিয়া। এই অঞ্চলে বুলিবুলি পাখি অপরিচিত অথবা অল্প পরিচিত। অথচ বুলবুলির মতই চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন পাখি হল টিয়া। আকারে এরা ময়নার চেয়ে সামান্য বড় এবং লেজটি লম্বা ও তীক্ষ্ণাগ্র। দেহ ঘাস রঙা সবুজ। ছোট মজবুত এবং গভীরভাবে বাঁকানো লাল টুকটুকে ঠোঁট আর গলার কাছে কালো ও গোলাপী রঙের একটি বেষ্টনি। গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে অথবা নগরে যেখানে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানেই এই টিয়াদের বিরাট ঝাঁক দেখা যায়। চাষী আর ফল বাগানের মালিকেরা এদের উৎপাতে ব্যস্ত থাকে। কারণ, এরা ফল ও শস্য যত না খায় তার চেয়ে বেশী নষ্ট করে আঁচড়ে কামড়ে। সারাদিন ধরে আশপাশের ক্ষেত খামার লুঠপাট করে খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসে। তাদের তীক্ষ্ণ সুরের কিয়াক কিয়াক ডাকটি সবসময় শোনা যায়। ওড়বার সময়ও তারা ডাকে, আবার চুপ করে বসে থেকেও তারা ডাকে।[২২]

বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু মোগল পরবর্তী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত পরিবর্তিত আইন যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত করেছিল তাকেই তুলনায় এনেছে এই জেলার মানুষ অত্যাচারের প্রতি তুলনায়।

১৭৬৫ খৃঃ ১২ই আগস্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজ বণিকেরা দেওয়ানি লাভ করে বাঙলার সমস্ত জমির মালিক হয়ে বসেছিল। এরপর জমিদারদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে ধার্য খাজনা আদায় করার জন্য রেজা খাঁ, গঙ্গা-গোবিন্দ সিং, দেবী সিং, হরেরাম প্রভৃতি নিষ্ঠুর উৎপীড়কদের নিযুক্ত করলেন। তারা কৃষকদের ঠেঙ্গিয়ে, ঘরবাড়ি জ্বলিয়ে গ্রামের বুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে খাজনা ও অতিরিক্ত আবওয়াব আদায় করত। কারণ কোম্পানির স্বার্থের চেয়ে তাদের নিজেদের আখের গোছাবার দিকেই নজর ছিল বেশী। তাছাড়া ভূমি রাজস্ব এমন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছিল যে পীড়ন পেষণ, লুণ্ঠন সত্ত্বেও তা কারো পক্ষেই আদায় করা সম্ভব হচ্ছিল না।

রাজস্ব আদায়কারীদের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা বাঙলায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য, সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যয়ভার বহনের জন্য এবং রাজস্ব আদায়ের অনিয়শ্চয়তা দূর করার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ কোর্ট অব ডিরেকটরর্স এর নির্দেশে পূর্ব প্রভাবিত দশ শালা বন্দোবস্ত পরিবর্তিত হয়ে গেলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, এর সঙ্গে যোগ হল ১৮১২ সালের পঞ্চম আইন, যে আইনের বলে ভূম্যাধিকারীরা যে কোন হারে খাজনা নির্ধারণ করার অধিকার লাভ করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কর সংগ্রাহক জমিদাররা জমির মালিক বলে ঘোষিত হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া হল সুদূরপ্রসারী । এই আইনে রায়তদের স্বার্থের কথা বলা হলেও তা ছিল অর্থহীন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বলীয়ান হয়ে জমিদাররা সহজেই আইনকে অস্বীকার করে নিঃসম্বল প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাতেন।

আগে অত্যাচারের কারণ ছিল বহিরাগত মারাঠা বর্গীর দল। আর এখন অত্যাচারের সেই স্থান দখল করেছে ইংরেজ তথা ইংরেজজাতির পোষাকের সাদৃশ্যে এসেছে টিয়াপাখি। পরিবর্তনের এই ইঙ্গিতটুকু বুলবুলি থেকে টিয়াপাখিতে স্থান গ্রহণ করে ধরা পড়েছে।

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন।

বর্গীর আক্রমণে অনেক মাতারই চোখের জল পড়েছে তার সন্তানের মৃত্যুর কারণে। বর্গীদের কেন্দ্র করে সেই সব ঘটনা আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে বিভিন্ন অঞ্চলে। এইরকমই একটি ঘটনা হল বর্গীরা একবার অতর্কিতে বীরভূম জেলার হেতমপুর গড় আক্রমণ করে। এখানকার জায়গীরদার

ছিলেন ওসমান খাঁ। এই দুর্গ রক্ষার জন্য তিনি বর্গীদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে প্রাণ দেন। প্রিয়তমের মৃত্যু সংবাদে ওসমান পত্নী আমিনা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বীরাঙ্গানার বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং নিরাশ হতোদ্যম সৈন্যদলকে আবার নতুন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। বীরাঙ্গানা আমিনার পরাক্রমে শত্রুদল পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হল। "তখন আমিনা অসি নিষ্কাশিত করে অশ্ব থেকে নেমে যেখানে ওসমান মহানিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন তথায় বীরপদে উপস্থিত হলেন।"[১৩]

বাংলাদেশে সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতকের কোনদিনও অভাব হয়নি। এই রকমই জনৈকের বিশ্বাস ঘাতকতায় অল্প কিছুদিনেরই ভিতরই হেতমপুর দুর্গ শত্রু সৈন্যের অধিকারে চলে যায়। আমিনা তখন তার শিশুপুত্র এবং নিজের ভবিষ্যৎ পরিণাম ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। নিরুপায় আমিনা তখন শিশুপুত্রের ভার দিতে চেয়েছিলেন নিকট আত্মীয় পরিজনকে । কিন্তু বর্গীর অত্যাচারের ভয়ে তখন কেউই ওসমান পুত্রের ভার নিতে না চাওয়ায় আমিনা তার শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে দুর্গ সন্নিহিত দীঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।[১৪] রকমফেরে এইরকম অনেক মাতার চিত্র ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট ধারণ করে রয়েছে।

৪। কি হলোরে জান
পলাশি ময়দানে নবাব হারাল পরান
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি নেবে সয়ে
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীর মদনের গায়।[১৫]

বাঙলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে পলাশির নাম কোনদিনও মুছে যাবার নয়। বাঙলার শেষে স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইষ্ট কোম্পানির মধ্যে এই প্রান্তরে যে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম হয় তার ফলাফলের চিত্রেই বাঙলাদেশের পরবর্ত্তী কয়েকটি শতাব্দী পরিচালিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।

"মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে পলাশির ন্যায় আর বিস্তৃত প্রান্তর নাই। এইজন্য এইখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাসমর সংঘটিত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৩ জুন, হিজরী ১১৭০ অব্দের ৫ সওয়াল বৃহস্পতিবার নবাব সিরাজদৌল্লা ও ইংরেজের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যের আশায় ভারতবর্ষে আসিয়া দেশীয় রাজগণের অকর্মণ্য ভাববশত আপনাদিগের রাজ্যলাভের পিপাসা বর্ধিত করিতে থাকেন। বাঙলার সুচতুর দূরদর্শী নবাব আলিবর্দী খাঁ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়া, মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজদৌল্লাকে ইংরেজদিগের দমনার্থ উপদেশ দিয়া যান।" [১৬]

আলিবর্দীর উপদেশই শুধু নয়, কার্যকারণক্রমে অবস্থা ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে উঠল। "২২শে জুন অপরাহ্ন পাঁচটার সময়ে ভাগীরথীর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি ভোগ করিয়া, রাত্রি একটার সময়ে পলাশীর সুবিখ্যাত আম্রকাননে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই আম্রকানন তৎকালে 'লক্ষাবাগ' নামে পরিচিত ছিল; ইহা দৈর্ঘ্য ১৬ শত ও প্রস্থে ৬ শত হাত ছিল বলিয়া কথিত আছে। চতুর্দিকে অনতি উচ্চ মাটির বাঁধ ও তৎপার্শ্বে সামান্য খাল। আম্রকুঞ্জের পশ্চিমোত্তরে শত হস্ত দূরে নবাবের একটি ইষ্টক গ্রথিত মৃগয়াগৃহ নির্মিত ছিল। সিরাজদৌল্লা মনকরা হইতে অগ্রসর হইয়া, দাদপুরের দক্ষিণে রাজা দুর্লভরামের পূর্বনির্দিষ্ট প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।"[১৭]

"ক্লাইভের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার - ২২০০ সিপাহী, ৮০০ ইউরোপীয়ান - পদাতিক ও গোলন্দাজ। নবাবের মোট সৈন্য ছিল ৫০,০০০-১৫০০০ অশ্বারোহী, এবং ৩৫০০০ পদাতিক। নবাবের মোট ৫৩টি কামান ছিল। সিনফ্রেঁ নামক একজন ফরাসী সেনানায়ক অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও মীরজাফরের অধীনে ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল।" [১৮]

মীরজাফরের সঙ্গে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী পলাশি যুদ্ধের পরিচালক নেতা ক্লাইভ জানতেন সে সৈন্য সামন্ত সকলেই নবাবের বিপক্ষে, সামান্য একটু যুদ্ধের অভিনয়ের পরই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সিরাজের দুই সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলালের রণপরাক্রমে ক্লাইভের সেই বিশ্বাস অন্তর্হিত হতে শুরু করল। তখন মীরজাফর ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করে রাত্রিবেলা নবাবকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত স্থির হল। "যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ইংরেজ পক্ষে আম্রবাগান ও সুব্যবস্থার কৌশলে বারুদ রক্ষা পাইল। কিন্তু নবাবের পক্ষে বারুদ ভিজিয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইল ; মীরমদনের কামানগুলি কার্য করিতে পারিল না। ইংরেজপক্ষেরও হয়ত এই অবস্থা, এই ধারণায় বীর মীরমদন তথাপি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সিরাজদৌল্লার ভাগ্য এক্ষণে তাঁহার পূর্বকৃত দুষ্কৃতির প্রতিফল আনয়ন করিল, প্রায়শ্চিত্তের দিন ঘনাইয়া আসিল। প্রভুহিতপরায়ণ মীরমদন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িলেন, গোলারী আঘাতে তাহার পদভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। আসন্ন মৃত্যু অবস্থায় তাঁহাকে সিরাজ শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। নবাব চাটুকার ও বিশ্বাসঘাতক পাত্রবর্গের প্ররোচনায় যুদ্ধজয়ের সুখস্বপ্ন দেখিতে ছিলেন, এমন সময় মীরমদন আনীত হইলেন। বাঙালি মুসলমান বীর স্বীয় প্রভুভক্তির এবং যুদ্ধের জন্যে কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে বলিতে স্বর্গগত হইলেন।"[১৯]

মীরমদন ছাড়াও সেনাপতি মোহনলাল ও অনেক সৈন্য সামন্তের প্রাণের বিনিময়ে ও পলাশীর স্বাধীনতা তথা বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় নি। আর এই যুদ্ধে ইংরেজদের মাত্র ২৩ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হওয়ার কথা ইংরেজরাই বলে থাকেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব সিরাজদৌল্লা স্ত্রী ও পরিজনসহ পালিয়ে যান, পরে ধরা পড়ে মীরজাফর পুত্র মীরণের হাতে প্রাণ হারান।

৫। খোকা যাবেন রথে চড়ে
ব্যাঙ হবে সারথি
মাটির পুতুল লটর পটর
পিঁপড়ে ধরে ছাতি।
ছাতির উপর কোম্পানি
কোন সাহেবের ধনতুমি।

পলাশীযুদ্ধে মীরজাফর ও তার বিরাট সৈন্য বাহিনীর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকার অন্যতম শর্ত ছিল যুদ্ধজয়ের শেষে বাঙলার নবাবী পদ মীরজাফরকে প্রদান। তাই "যুদ্ধ শেষে ক্লাইভ মীরজাফর খাঁর এক পত্র পাইলেন; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, কল্য প্রাতে দাদপুরে সাক্ষাৎ হইবে। অর্ম বলেন, সৈন্যগণের মধ্যে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের কথা প্রচার হওয়ায় তাহারা মহোল্লাসে দাদপুর-যাত্রার আদেশ পালন করিল; নবাব শিবিরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের ইচ্ছায় বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে নাই। ইংরেজ পক্ষ হইতে কেবল নবাবের শকট ও বলীবর্দগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল।"[২০]

২৯শে জুন সকালবেলা দুই শত গোরা ও পাঁচ শত সিপাহী সঙ্গে করিয়া ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হলেন। বাদ্যবাজনা সহ বিজয়গর্বে ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ প্রবেশের এই দৃশ্যটি দেখবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় সেদিন জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর।

এক আগ্রাসী মনোভাব ও ব্যবসায়িক বংশবিস্তারের অসামান্য কৌশলের জন্য ব্যাঙ নামক প্রাণীটির সাথে ইংরেজ ও তার গোরা বাহিনীকে বার বার প্রতীকে ব্যবহার করেছে লোককবিগণ। আর সারথি ব্যঞ্জনার্থে প্রকৃত চালক। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর রাজা হলেন ঠিকই কিন্তু রাজ্য চালনা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত রশিটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তুলে নিল নিজের হাতে এই সন্ধিলগ্ন থেকে। কিন্তু বাঙালি সেদিন ইংরেজ নামক সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে শুধু দেখবার জন্য ভীড় করেছিল যাদের চেহারা চলন বলন বুদ্ধি সবকিছুই

বাঙালিদের থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ইতিহাসের এক বিপুল পরিবর্তনের কোন আঁচই তারা অনুভব করতে পারে নি সেদিন।

নগরে প্রবেশের সময় জনসমাগম দেখে ক্লাইভ যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরে কোন মহাসভায় সাক্ষ্য দেবার সময় ক্লাইভ বলেছিলেন - 'মুর্শিদাবাদের রাজপথে সেদিন যত লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে সেই মুষ্টিমেয় ইংরেজদলকে যষ্ঠি ও লোষ্ট্র নিক্ষেপেই সংহার করিতে পারিত।'[২১]এরপর মুরাদবাগে এসে উপস্থিত হলেই মীরজাফর পুত্র মীরণ তাকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। মীরজাফর পাত্র মিত্র সহ সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। প্রাসাদের সবচাইতে সুসজ্জিত ঘরে মসনদ সাজান হয়েছিল। মীরজাফর মসনদে বসতে ইতস্তত করায় ক্লাইভ 'তাঁহার হস্তধারণ পূর্বক মসনদে বসাইয়া দিয়া ২৮ ইংরাজ কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ স্বয়ং সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা নজর প্রদান ও বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদার সম্বোধনে অভিবাদন করিলেন।'[২২] ক্লাইভের এই আচরণে সকলেই আপ্লুত হয়ে মীরজাফরকে বাংলার নবাব বলে স্বীকার করে নিলেন, এমনকি সিরাজের পক্ষপাতী যারা ছিলেন তারাও মীরজাফরকে নবাব বলে মেনে নিলেন। মীরজাফরের এই নতুন মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রী হলেন রাজা দুর্লভরাম। একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যের প্রভূত লোকসংখ্যার ঘরে ও বাইরে কোথাও কোন বিরোধিতা কোন প্রতিবাদ শোনা গেল না। এইরকম একটি মুহূর্তে সমগ্র মুর্শিদাবাদের মানুষ যেন নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের ভূমিকাই পালন করেছিলো।

মীরজাফরকে সিংহাসন বসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেই ইংরেজরা তাদের হিসাব বুঝে নিতে চাইলেন। মীরজাফর যে পরিমাণ অর্থ ইংরেজদের দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন তত অর্থ তখন রাজকোষে ছিল না। শুধু তাই নয় অর্থপ্রাপ্তির আশা ছিল ষড়যন্ত্রকারীদেরও। এই উপলক্ষে যুদ্ধ পূর্বে একটি চুক্তিপত্রও সাক্ষরিত হয়েছিল। জগৎ শেঠের মধ্যস্থতায় ক্লাইভ, মীরজাফর, দুর্লভরাম, ওয়াট্স, তারাচাঁদ প্রভৃতি আলোচনায় বসলেন। সন্ধিপত্রগুলি পঠিত হল, এই সন্ধিপত্রের চুক্তি অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা পেলেন প্রচুর টাকা, একমাত্র ওমিচাঁদ ছাড়া। (আর ইংরেজ কোম্পানিকে মীরজাফর দিলেন ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খৃঃ মধ্যে নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। ক্লাইভকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হয়েছিল তার থেকে বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। পরবর্তীতেও এক বিপুল পরিমাণ আর্থিক দায়ের বোঝা বহন করতে হয়েছে এবং নিঃস্ব হতে হয়েছে শুধু মীরজাফরকেই নয় জগৎ শেঠ, দুলর্ভরাম, উমিচাঁদ ইত্যাদির মত ধনকুবেরদের। ইংরেজদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য এই সব মানুষেরা তখন যে হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন লোককবির কলমে তাই চিত্রিত হয়েছে 'পিপড়ে ধরে ছাতি' এই ব্যঙ্গাবাণে। নবাবী আমলে 'ছত্রী' উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীই ছিলেন, যাঁরা নবাব বা রাজার চলার সময় মাথায় ছাতা ধারণ করে থাকতেন - বিশেষ করে নবাব যখন সভায় যেতেন। মালাধর বসু (গুণরাজ খান), কেশব বসু (কেশব খান) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও একসময় রাজপ্রসাদে ছত্রীর কাজ করতেন। এই হীন মানসিকতার প্রতিচ্ছবি কেবলমাত্র প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ ব্যাপারই ছিল না মুর্শিদাবাদের সকল মানুষ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল যে, (৩রা জুলাই, ১৭৫৭ খৃঃ) সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া প্রথম কিস্তির টাকা দুই শত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। ঐ দিনই সিরাজদৌল্লার শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে চড়ইয়া আর একদল লোক শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল।"[২৩]

৬। মহারাজ নন্দকুমার রে
তোর রাজপাট জমিদারি কারে দিলিরে
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙলার অধিকারী
হেস্টিং সাহেব এলো জান করিবারে বারি
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা খোঁড়া ডিঙ্গি বেয়ে।।
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফৌহারাতে ফাঁস

যোড় বাঙলায় কাঁদে সোনার গুলতি বাঁশ।
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণী গো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিঁদুর বঞ্চিত করিলেন বিধি।

নন্দকুমার রায় এর জন্ম আনুমানিক ১৭০৫ খৃঃ। পিতা পদ্মলাল রায়। প্রথমে বয়সে ইনি হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমিন বা তসিলদার পদে নিযুক্ত হন। পরে উকিল হিসাবে ক্লাইভের সঙ্গে পাটনায় যান। ক্লাইভের উপর তার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে লোকে নন্দকুমারকে The Black Colonel বলত। ১৭৫৬ খৃঃ নন্দকুমার হুগলির ফৌজদার হন। ১৭৬৪ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি দেন। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে বর্তমান নদীয়া ও হুগলীর কালেকটর পদে নিয়োগ করে। ১৭৬৫তে তিনি বাঙলার নায়েব সুবার পদ প্রাপ্ত হন।

নন্দকুমার যখন কোম্পানির মারফত বর্ধমান প্রভৃতির সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত হন তখন থেকেই ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তার বিবাদ আরম্ভ হয়। নদীয়ার পাওনা রাজস্ব বাকি থাকার নন্দকুমার তা চেয়ে পাঠান এই বলে যে রাজস্ব সময়মত না দিলে তাকে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। নদীয়ার রাজা ভয় পেয়ে ইংরেজদের শরণাপন্ন হন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ধার পান। নন্দকুমার এই সময় বর্ধমান রাজের কাছেও রাজস্ব চেয়ে পেয়াদা পাঠান, বর্ধমানরাজও মুর্শিদাবাদে সংবাদ পাঠান এই বিষয়ে উপায় বিবেচনা করে। এইসময় হেস্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ধমানরাজের এই পত্র পেয়ে হেস্টিংস নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। নন্দকুমারও নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে তার নিয়োগ ও খেলাত প্রাপ্তির কথা লিখে পাঠান। হেস্টিংসের মাধ্যমে রাজস্বের টাকা কোম্পানির কাছে জমা না দিয়ে নন্দকুমারের এই নিজস্ব উদ্যোগে হেস্টিংস রীতিমতো বিরক্ত হন। ক্রমাগত এই ব্যবস্থায় এবং টাকা তার মাধ্যমে জমা পড়ার যে উভয়বিধ সুবিধা ছিল নন্দকুমার তার অন্তরায় হয়ে উঠায় "নন্দকুমারের প্রতি হ্রেষ্টিংসের অসন্তোষের বীজ রোপিত হয়, সেই বীজ ক্রমে বর্ধিত হইয়া মহান বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।"[২৪]

বাঙলার ইতিহাসে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি উল্লেখযোগ্য এবং আলোড়িত একটি ঘটনা। হেস্টিংসের চারজন সদস্য ছিলেন, কর্ণেল মনসন, জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার ফিলিপ ফ্র্যান্সিস ও রিচার্ড বারওয়েল। বারওয়েল ছাড়া অন্য তিনজন ইংলন্ড থেকে আসেন এবং হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এই বলে যে, কোম্পানির নিয়মের বিরূদ্ধে হেস্টিংস প্রচুর পরিমাণ উৎকোচ নিয়ে রাজা গুরুদাস (নন্দকুমারের পুত্র) এবং মণি বেগমকে (নবাব মোবারকদৌল্লার অভিভাবিকা) নিজের কাজে ব্যবহার করেন, আর ঘুষ নিয়ে অনেক দোষী ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার হেস্টিংস বারওয়েলের দ্বারা নন্দকুমারের নামে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে পাল্টা অভিযোগ নিয়ে আসেন। এই অভিযোগ লেমেস্টার (Lemaistre) ও হাইড (Hyde) নামক বিচারপতির সমক্ষে ১৭৭৫ খৃঃ ৬ই মে উপস্থিত করা হয়। এই অভিযোগ চূড়ান্ত বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রথম এবং প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের (Sir Elijah Impey) কাছে পাঠান হয়। ১৭৭৫ খৃঃ ১৬ই জুন সকালবেলা বিচারপতি বা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং শাস্তি হল মৃত্যু। ৫ই আগস্ট ফাঁসির দিন ঠিক হয়।

কলকাতা খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজার ও হেস্টিংস সেতুর মধ্যবর্তী নদীর কাছে ময়দানে নন্দকুমারের বধ মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দেখতে সেদিন জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। "এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে সমস্ত দর্শকমন্ডলীর মধ্য হইতে এক মর্মস্পর্শী কাতরধ্বনি উঠিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। অনেকে সেই দৃশ্য দেখিতে অশক্ত হইয়া পলায়ন করিল; কেহ কেহ বসন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ এই পাপ দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পবিত্র-সলিলা ভগীরথী জলে পতিত হইল।"[২৫] বাঙলার জনসাধারণ বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, মহারাজ নন্দকুমারের সত্যিই ফাঁসি হবে একজন সাধারণ অপরাধীর মতো। সেদিন কলকাতার বর্ণ হিন্দুরা কেউ রান্না করেন নি। ব্রহ্মহত্যা পাতকে কলিকাতা কলুষিত হল এই ভেবে অনেক ব্রাহ্মণ শহর ত্যাগ করে গঙ্গার অপর পারে উত্তর পাড়ায় বসতি স্থাপন করল।

মহারাজ নন্দকুমার একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু তথা পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তার এক পুত্র (গুরুদাস) ও তিন কন্যা ছিল (সম্মানী আনন্দময়ী ও কিনুমনি)। নন্দকুমার দুটি স্ত্রীর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু লোকছড়া তুলে এনেছে অজ্ঞাত, অখ্যাত দুটি স্ত্রীর ভাগ্যহীন হওয়ার আক্ষেপের কথা।

সারাজীবনে তিনি মামলা মোকদ্দমায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে অর্থোপার্জন বৃদ্ধি করার অন্য কোন উপায় তিনি পান নি। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় বিরাট প্রাসাদ ও নগদ বাহান্ন লক্ষ টাকা তিনি সন্তানদের জন্য রেখে যান। এছাড়া তিনি ভদ্রপুরে নবরত্নের এক বিশাল মন্দির তৈরী করে সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া আরও অনেক মন্দির তিনি নির্মাণ করেন। এই নন্দকুমার তার বিপুল সম্পত্তি ও বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশ্য জায়গায় জনতার সামনে অনাকাঙ্খিত মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। এই মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে এত দুঃখ বেদনার জন্ম দিয়েছিলো যে তার থেকে অনেক লোকছড়া রচিত হয়েছিল।

এইরকমই অন্য আর একটি ছড়া হলো -

আজগুবি এক আইন হইয়েছে,
কোন চলিদের (কাউন্সিলারদের) সাথে
হেস্টিংস ঝগড়া বাধিয়েছে।
হায় হায় একি হলো বামুনের ফাঁসি হলো,
নন্দকুমার মারা গেল,
গুরুদাস ধুলায় পড়েছে। [২৬]

৭। আদুর বাদুর চালতা বাদুর
কলা বাদুরের বিয়ে ।
টোপর মাথায় দিয়ে,
চামচিকেতে বাজনা বাজায়
খ্যাংরা কাঠি দিয়ে ।

আলোচ্য ছড়াটিতে এমন কোন ছবি ভেসে ওঠে না, প্রচলিত ধারণায় যাকে সৌন্দর্যময় অভিধা দেওয়া যায়। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না এই চিত্র বাঙলাদেশের সেই সময়টিকে মনে করায় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে বিখ্যাত।

যে কোন দেশে যে কোন সময়েই প্রকৃতির খেয়ালে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে শস্য উৎপাদনের ঘাটতির ফলে মন্বন্তর হতে পারে। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল প্রাকৃতিক কারণেই নয়, এক শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় চক্রান্তই এর পেছনে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল বলা যায়।

১৭৬৫ খৃঃ লর্ড ক্লাইভ শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করার পর বাঙলার রাজস্ব আদায়ের ভারও তাদের হাতে চলে আসে। দেওয়ানী লাভের আগেই ইংরেজদের আগ্রাসী চেহারাটা বাঙালিদের কাছে অপরিচিত ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর বর্বরোচিত লুণ্ঠন যজ্ঞের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে পার্লামেন্টরী তদন্ত কমিটির সামনে ক্লাইভ বলেছিলেন - "ভেবে দেখুন একবার পলাশীর বিজয়ের পর আমার অবস্থা। একজন মহান রাজা (নবাব) আমার ইশারায় উঠে আর বসে, একটি ঐশ্বর্যশালী শহর (মুর্শিদাবাদ) আমার পদানত। শহরের মহাধনী ব্যাঙ্কার ব্যবসায়ীরা আমার একটু হাসি পাবার জন্য শশব্যস্ত। আমার আগমনে খুলে দেওয়া হয় ধন-ভাণ্ডার। সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, জহরত আমার দুপাশে করছে থৈ থৈ। মিঃ চেয়ারম্যান ভেবে দেখুন কে সম্বিত রক্ষা করতে পারে এসব দেখে? হাত যে আরও বাড়ায়নি আমার এ বিনয়ে আমি নিজেই অবাক।"[২৭]

দেওয়ানি লাভের পর সেই লোভ তার লালসায় পরিণত হল। বাঙলায় রাজস্ব আদায় করার জন্য তিনি রেজা খাঁ, সিতাব খাঁ ইত্যাদি অত্যাচারীদের উপর ভার দিলেন। তাদের কাছ থেকে রাজস্ব বুঝে নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। ফ্রান্সিস সাইকম ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট। তার উত্তরাধিকারী ছিলেন কুখ্যাত রিচার্ড বেকরে। এই ব্যবস্থার প্রথম বছরেই (১৭৬৫-৬৬) কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায় দ্বিগুণ (২ কোটি ২০ লক্ষ) রাজস্ব আদায় করে অন্যদিকে কর্মচারীদের বে-আইনি উৎকোচ গ্রহণ ও ব্যক্তিগত ব্যবসার নামে লুণ্ঠন এবং 'কোম্পানির প্রকাশ্য ব্যবসা' অর্থাৎ রাজস্বের এক অংশ লগ্নী করে এদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের নামে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে ইউরোপ চালান করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করল। একদিকে পরোক্ষ শোষণ অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ের যাঁতাকলে এইসব মানুষেরা নিষ্পেষিত হয়েছে দিনের পর দিন। একটা সময় তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল।

এক অপরিসীম শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে (১৭৭০ খৃঃ, বাংলা ১১৭৬ সন) বাংলা ও বিহারের বুকে এক অশ্রুতপূর্ব দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছিল। ইংরেজ বণিকদের সৃষ্টি এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ শিকারে পরিণত হল। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রত্যেক দিন হাজার মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। কৃষকদের মধ্যেই মারা গিয়েছিল শতকরা ৫০ জন। জনবহুল গ্রামগুলি জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল।

বীরভূমের গ্রামগুলি এমন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে মন্বন্তরের দশ বছর পরেও সৈন্যদের পক্ষে সে সব স্থান অতিক্রম করা সম্পূর্ণভাবে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এত কৃষক মারা গিয়েছিল যে মন্বন্তরের পর নিজ নিজ জমিতে চাষী বসাবার জন্য জমিদারদের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশে খোদাবন্দ রায়তদের চাইতে পাইকন্দ রায়তদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যের এই দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে জীবন্ত বর্ণনা আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। তিনি লেখেন - 'লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়; উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমি বেচিল। তারপরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল, ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইঁদুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পালাইল, যাহারা পালাইল না তাহারা অখাদ্য খাইয়া না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সময় জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত, বিশেষত বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল, কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে... অতি রমণীয় অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে।" [২৮]

প্রচলিত এই ছড়াতেও এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় -

নদনদী খাল বিল সব শুখাইল।
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে
দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে।
এক চেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর।
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।

উইলিয়াম উইলসন হান্টারের 'গ্রাম বাংলার ইতিকথা' মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা হান্টারের দলিল নির্ভর সজীব বিবরণের স্বাধীন মর্মানুসরণ অর্থাৎ উপন্যাস হলেও বঙ্কিমের বর্ণনার প্রত্যেক কথার দলিল প্রমাণ আছে। 'পদচিহ্ন' গ্রাম কল্পিত হতে পারে, কিন্তু সে জায়গায় অনায়াসে নাটোর বা ভাতুরিয়া বসানো চলে অথবা রংপুর, পূর্ণিয়া, মুর্শিদাবাদের যে কোন গ্রাম।[২৯] আমাদের আলোচ্য ছড়ায় তাই সেই সমস্ত প্রাণীদের উল্লেখ দেখা যায় যারা রাতের অন্ধকারের প্রতীক বহন করে যে অন্ধকার অন্তহীন। কারণ এখানে সমস্ত অসুন্দরের, অমঙ্গলের প্রতীকগুলি একে অপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে (আদুর বাদুর চালতা বাদুর, কলা বাদুরের বিয়ে)। ইতিহাসও ওই অন্ধকারের সাক্ষী দিয়ে বলে শুধু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরই নয় এই মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল পর পর কয়েকটি বছরেও। আর সব অনাসৃষ্টির মূলেই মানুষের সীমাহীন লোভ আর লালসা। শুধু বিদেশীরাই নয়, দেশের মানুষও এর জন্য সমানভাবে দায়ী।

৮। গড়গড়ের মা লো
তোর গড় গড়াটা কই?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে
পিঁপড়ে টানে মই।

ছড়াটির স্থান কাল এবং সময় নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও বাংলাদেশের সর্বত্র এই ছড়াটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে বেঁচে রয়েছে।

গড়গড়া শব্দটির অর্থ হলো তামাক খাওয়ার এক প্রকার গুড়গুড়ী বা আলবোলা, যা কেবল অভিজাত মানুষেরাই ব্যবহার করত। 'গড়গড়ের মা লো'- কোন অভিজাত মহিলাকে সম্বোধন।

প্রায় অর্ধবঙ্গের অধীশ্বরী জমিদার রাণী ভবানীকে তার প্রজারা এবং তার মৃত্যু পরবর্তী আজ পর্যন্ত তাঁর পূণ্যকার্যের ভাগীদার বাঙলার সাধারণ মানুষ তাঁকে জমিদার নয় মা বলেই জানত। তার পূণ্যকর্মাদি এবং তাঁর ব্যক্তিগত আচরণই তাঁকে এই সম্মানের আসন দিয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন -
একটি রমণী মূর্তি বসিয়া নীরবে
গৌরাঙ্গিনী দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ণনয়ন
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে
শোভিছে উজলি- জ্ঞান গর্বিত বদন। (পলাশীর যুদ্ধ)।

রানি ভবানী যখন রাজশাহী রাজ্যের শাসনকার্যের উত্তরাধিকারিণী হলেন তখন তার জমিদারীর আয় দেড় কোটি টাকার উপর ছিল। বাংলাদেশ তখন একাদশ চাকলায় বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে আট চাকলাই ছিল রাজশাহীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত; যার মধ্যে ছিল মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, ভূষণা, আকবর নগর, জাহাঙ্গীর নগর, বর্ধমান, যশোহর এবং এবং কড়াইবাড়ী। নবাব সরকারকে দেয় ৭০ লক্ষ টাকা বাদে রানি ভবানী অবশিষ্ট টাকা ধর্মকার্যে সাধারণ হিতার্থে ব্যয় করতেন। শোনা যায় ইনি সবরকম পূণ্য ও দান কাজে ৫০কোটি টাকার বেশী ব্যয় করেছিলেন। তাঁর পূণ্য কাজের তালিকায় বিবিধ মন্দির, জলাশয়, অতিথিশালা, নিষ্কর ভূমিদান, বৃত্তিদান এমনকি পশু-পাখিদের জন্য আহারের ব্যবস্থাও ছিল। নিজে ছিলেন কঠোর ব্রতচারিণী সন্ন্যাসিনী। বিজয় সেনের তীর্থমঙ্গলে রানি ভবানীর যশোগাথা এইরকম ঃ-

জত জত লোক আসি কাশীর ভিতরে,
ভবানীর সমকীর্তি কেহ নাহি করে।।
রাণী ভবানীর যশ না যায় কথন,
কত স্থানে কত ছত্র কত বিতরণ।।
প্রস্তরের বাটী কতো রচন করিয়া,
বৎসরের খরচ দিয়া দিলা বিলাইয়া।।

সদ্যব্রত স্থানে স্থানে কত দেবালয়।
যেবা যাহা চাহে তাহা ততক্ষণে পায়।।[৩০]

হালের গরু বাঘে খেয়েছে পিঁপড়ে টানে মই ঃ কিন্তু রানি ভবানীর এই সুদিন খুব বেশী দিন আর রইল না। ক্লাইভের আমলেও যে জুলুম রানির উপর হয়নি নতুন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর ১৭৭২ খৃঃ সরাসরি কোম্পানির দেওয়ানী প্রবর্তিত হওয়ায় এবার সেরকম জুলুম আরম্ভ হল। অন্যান্য সুপারভাইজারদের সঙ্গে রাউজ সাহেব ফিরে যাবার পর রাজ্যভার আবার রানির হাতে পড়েছিল, কিন্তু আগের মত জমিদারীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব আর পেলেন না। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থার জন্য চারজনের সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দিলেন । ভ্রাম্যমান এই কমিটিই ঘুরে ঘুরে রাজস্বের উর্দ্ধতম মাত্রা নির্দিষ্ট করলেন। কমিটির সদস্যরা নদীয়া কাশিমবাজার থেকে রাজশাহীতে এলেন। রানি ভবানী তাদের আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করলেন না কিন্তু তাতে কোন ফল হল না - "যে রাজ্যে রানি ভবানী জীবন- মরণের বিচার কর্ত্রী, অন্নদাত্রী, কল্যাণ বিধাত্রী মহাদেবী, সেই রাজ্যের বুকের উপর কোম্পানির ঢোল ভীমকলরবে ঘোষণা করিল, সে রাজ্য আর ভবানীর নহে, যে অধিক রাজকর দিতে অগ্রসর হইবে রাজমুকুট তাহারই।" [৩১]

রানি ভবানী এই সময় প্রজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংসের প্রস্তাবেই সম্মত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে রাজ্য রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু তারপরেও হেস্টিংসের রাজস্ব নীতি উত্তরোত্তর আরও বেশি রাজস্বের দাবী জানাতে থাকল। কারণ এটিও ছিল সুচতুর ইংরেজদের কৌশল, রানি ভবানীকে রাজ্যচ্যুত করে নতুন ইজারা দিয়ে আরও বেশি অর্থ আদায়ের চেষ্টা। ইংরেজদের এই পদ্ধতিটি বজায় রাখার ক্ষেত্রে রানি ভবানীর এলাকায় দুজন কুখ্যাত আমিল ছিলেন তার সহায় একজন প্রাণ বসু অন্যজন দুলাল রায়।

"প্রাণ বসু অতি নীচ প্রকৃতির আমিল ছিলেন, দুলাল রায় ততোদিক নীচাশয়। ইংরেজদের দেওয়ানী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বড়ো কর্তা হয়ে আসেন নতুন রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইক্‌স এবং তার লোক প্রাণ বসু। এই লোকটি প্রভুর প্রাসাদে রেজা খানের আপত্তি সত্ত্বেও রাজশাহীর তাহুদ হস্তগত করেন এবং তার অত্যাচার ও শোষণে সেখানে এমন অবস্থা হয় যে সর্বনাশা সন ছিয়াত্তরের আগে থেকেই নাটোর রাজ্য উজাড় হয়ে যেতে শুরু করে। মন্বন্তরের বছর রাউজ প্রথমেই লক্ষ্য করেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাণ বসুর অত্যাচারে ভাতুরিয়া পরগণার বহু জমি পতিত হয়ে আগাছায় ভরে গেছে। সেই প্রচন্ড অত্যাচারের যুগেও প্রাণ বসুর মত অত্যাচারীকে মুর্শিদাবাদ দরবারে অসহ্য ঠেকায় তাঁকে সরিয়ে নিয়ে আবার রানি ভবানীর উপর রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। ছিয়াত্তর সনে মহম্মদ রেজা খান তাঁর নিজের লোক দুলাল রায়কে নাটোরের আমিল নিযুক্ত করেন। এই লোকটি রানি ভবানী ও মিস্টার রাউজের কাছে সমান রকম অসহ্য ছিল। মিস্টার রাউজের বর্ণনা অনুযায়ী সে ছিল একটা নীচ, নিরক্ষর লোক মহম্মদ রেজা খানের বংশবদদের মধ্যে সবচেয়ে নীচাশয়। তার পিয়নরা ভাতুরিয়া পরগণায় বহুদিন ধরে নিযুক্ত রানি ভবানীর পুরনো নায়েবকে ধরে নিয়ে গিয়ে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করেন। একজন নিম্নস্তরের আমলাকে দিয়ে সেই ছারখার পরগণায় খাজনা আদায় শুরু হল। [৩২]

রানি ভবানী অসহায়ভাবে তাঁর একদা সমৃদ্ধ ও সুখী প্রজাদের দুর্দশা দেখে যেতে লাগলেন। যে প্রজার দুঃখে তিনি দিনের পর দিন খাজনা মকুব করে দিয়েছেন, প্রখর অনাবৃষ্টি ও অনাহারের মধ্যেও সেইসব প্রজাদের উপর বিপুল হারের খাজনা দেওয়ায় বোঝা যেন পিঁপড়েকে দিয়ে মই টানানোর মতই অসম্ভব একটি ব্যাপার ছিল। মই যেমন মাটির ঢেলাকে চাপ দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, রাজস্বের চাপে প্রজার অবস্থাও ছিল অনুরূপ।

১০ । হাতীপর হাওদা ঘোড়াপর জীন্।
জলদী যাও জলদী যাও ওয়ারেন হস্টিন।

বেনারসের রাজা বলবন্ত সিংহের ১৭৭০ খৃঃ ২২ শে আগষ্ট মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র চৈৎ সিং বেনারসের রাজা হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অযোধ্যার নবাবের অধীনতা মুক্ত হয়ে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের অধীনতা স্বীকার করেন।

প্রতিবছর ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিংহের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করতেন। কিন্তু এইভাবে বিনা পরিশ্রমে অর্থলাভ করে ওয়ারেন হেস্টিংসের লোভ দিন দিন আরও বেড়ে যেতে লাগল। ফলে অর্থ দাবির মাত্রা হেস্টিংস আরও বাড়িয়ে দিয়ে চৈৎ সিংকে তিনি রাজ্যচ্যুত করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, এবং সঙ্গে লোকজন নিয়ে তিনি ১৭৮১ খৃঃ ১৪ই আগষ্ট কাশীতে উপস্থিত হন। ১৫ই আগষ্ট হেস্টিংসকে এই বলে পত্র লেখেন যে, "রাজা ইংরেজরাজের অধীন হইয়াও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং কাশীরাজ পথে প্রকাশ্য ভাবে অত্যাচার করিয়াছেন"। [৩৩] এই চিঠি চৈৎ সিংহকে স্তম্ভিত করলেও নিরুপায় তিনি জবাব দিলেন যে, হেস্টিংস সাহেবের যাবতীয় দাবি তিনি পূরণ করিয়াছেন এবং হেস্টিংস সাহেব তাহার নামে সে সমস্ত অপরাধ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।"[৩৪] হেস্টিংস এই পত্র পেয়ে অপমানিত বোধ করলেন এবং রেসিডেন্টকে প্রাসাদ আক্রমণ করে চৈৎ সিং কে বন্দী করার হুকুম দিলেন। সেই মতো রেসিডেন্ট কাজ করলে বারাণসীর জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এই সময় একজন ইংরেজ চোপদার অশ্লীল ভাষায় রাজার অবমাননা করলে, জনতা ইংরেজদের আক্রমণ করে। চৈৎ সিংহের সৈন্যরা এই সংবাদ পেয়ে, রামনগরবাসীদের সঙ্গে যোগ দেন। তাদের তরবারির আঘাতে ইংরেজ সিপাহীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। এই অবসরে মহারাজা চৈৎ সিংহ কাশীর প্রাসাদ থেকে পালিয়ে, নদী পার হয়ে রামনগর দুর্গে আশ্রয় নেন। এখান থেকে চৈৎ সিংহ ওয়ারেন হেস্টিংসকে চিঠি লিখে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং লেখেন হেস্টিংস সাহেব যাহাই আদেশ করিবেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।[৩৫] কিন্তু হেস্টিংস এই অনুরোধেও কর্ণপাত না করে চৈৎ সিংহকে নির্যাতন করতে আদেশ দিলেন। কাশীর জনগণ এইসময় ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। হেস্টিংস নিজের জীবনকে এই পরিস্থিতিতে নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। জনতা তার সন্ধান পেলে যে বীভৎস অত্যাচার করতে পারত পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকেরাও সেকথা স্বীকার করেছেন- 'He (cantoo Babu) was not worth a farthing as to any transaction that happened when Mr. Hastings was in the upper provinees; where though he was his faithful and constant attendant through the whole, yet he could give no account of it"[৩৬]

সারা বেনারস জুড়ে ক্ষিপ্ত লোকের হট্টগোলে পূর্ণ হয়ে উঠল। এই অবস্থায় হেস্টিংস কাশীতে অবস্থান করা নিরাপদ নয় মনে করে, রাত্রিবেলা চুনার দুর্গে পালিয়ে গেলেন। তার পলায়নকে উপলক্ষ করে চৈৎ সিংহের লোকের মুখে মুখে আলোচ্য ছড়াটি ফিরত।

১১। সুরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ী খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল
ওঁ তৎ সব বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল;
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিন কুল। [৩৭]

"১৭৭৪ খৃঃ বর্ধমান জেলার অর্ন্তগত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহন পাটনা বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ঐ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্তন করিয়া পারসীতে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা লইয়া তাহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে।"[৩৮] এরপর ১৮১৫ সালে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা বসে। যেখানে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হত। রামমোহন সেখানেও নিজের মত ব্যক্ত করেন হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।

১৮১৫ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রচুর বইও লেখেন। এই সব বইয়ের সমালোচনার উত্তরে বিরোধীরা অভদ্র, কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে পুস্তক রচনা করতে লাগলেন। কিন্তু রামমোহন তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

ছাপার অক্ষরে সতীদাহকে নৈতিক আদর্শানুযায়ী সমর্থনের অযোগ্য ও বলপূর্বক বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারাকে অশাস্ত্রীয় বলে তিনি প্রথম নিন্দা করেন ১৮১৭ খৃঃ প্রকাশিত A second Defence of the monotheistical system of the vedas নামক গ্রন্থে।

এরপর ১৮২৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্স্ট গভর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। "১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিকটেই এক হত্যাকান্ড ঘটে, তাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সহমরণ নিবারণ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং সহমরণ প্রথা নিবারিত না হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থাপিত হয়। সেগুলি হল - ১. কোন সহগমনার্থিনী বিধবাকে স্বামীর দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্য কোনরূপে দগ্ধ করা হইবে না, বা অপর কোনও প্রকারে হত্যা করা যাইবে না; ২. সহগমনার্থিনী বিধবাদের অপরের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতিপত্র লইলে চলিবে না, নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় জানাইতে হইবে ও অনুমতি লইতে হইবে; (৩) সতীর সহমরণে সহায়তাকারী কোনও ব্যক্তি গভর্ণমেন্টের চাকুরী পাইবে না; ৪. সহমৃতা বিধবার মৃত পতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গভর্ণমেন্টের বাজেয়াপ্ত হইবে।" [৩৯]

এই আইনের বিরূদ্ধে আর একটি আবেদন পত্র সহস্র লোকের সাক্ষর সহ জমা পড়ল। এই সময় রামমোহন আইনের বিরূদ্ধাচারণের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি একাধিক বাংলা ও ইংরাজীতে বই লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, সহমরণ হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়। এই সময় থেকে বাঙলার জনসাধারণ রাজা রামমোহনের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিরূদ্ধচারীদের আবেদন সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হল। "সরকারের কাছে তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে রক্ষণশীল দল ধর্মসভা গঠন করে সতী-নিরোধ আইনের বিরুদ্ধে ইংলন্ডে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন পাঠালেন। অন্যদিকে রামমোহনের মত কালা পাহাড়দের বিরূদ্ধে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ হল। প্রকাশ্য ব্যবস্থা অবশ্য এদের সমাজচ্যুত করা। আর অপ্রকাশ্য উদ্যম রামমোহনকে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। গুপ্ত ঘাতকের ভয়ে এই সময় রামমোহনকে কত সর্তকভাবে অবস্থান করতে হত তার এক সমসাময়িক বিবরণ দিয়েছেন 'John Bull' পত্রিকা। এসবের মধ্যে অবিচল থেকে রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবর্গ ১৬ই জানুয়ারী ১৮৩০ খৃঃ বেন্টিংঙ্ককে সতীদাহ নিবারণের জন্যে প্রকাশ্য অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু রামমোহন এখানেই থামেন নি। তাঁর সতীদাহ বিরোধী সংগ্রামের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংলন্ডে। সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন একক যোদ্ধা। [৪০]

সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাচীন এই রীতিটির উপর হস্তক্ষেপ করে রামমোহনের উপর হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যে ভীষণরূপে বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিরূপতা বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতকে কেন্দ্র করে। রামমোহন মানসের মূল প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক এবং তার গভীর ধর্মপ্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের নিজ সত্যগুলির সাথে সামাজিক সংহতিকে পূর্ণ মর্যাদা দান। রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মমত ব্রাহ্মধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলেই হিন্দুদের বিদ্বেষের কারণ ও রামমোহনের উদ্দেশ্যগুলি বোঝা যায়। - ১. প্রথম জীবনে ইসলামীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে একেশ্বরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন। ২. ইসলামীয় ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে সেই একেশ্বরবাদের প্রত্যাদেশবিরোধী সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক deism-এর রূপগ্রহণ; ৩. ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র বিশেষত বেদান্ত অনুশীলনের ফলে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসঞ্চার ও ধর্মচিন্তায় যুক্তির (reason) পাশাপাশি শাস্ত্র (Scripture) ও সহজ বুদ্ধি (Common scince)-র উপযোগিতা স্বীকার এবং ৪. খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য সমাজ-চিন্তা প্রভৃতির প্রভাবে মানবপ্রীতি ও মানবসেবাকে ব্রহ্মতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ করা।[৪১] উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পরিবার তথা বর্ণহিন্দুর আত্মশ্লাঘার বিষয় একটি মেলের (ব্রাহ্মণ কুলীনদের চিহ্নিত করা হত যার দ্বারা, তারই একটি সুরাই মেল) প্রতিনিধিমূলক

চরিত্র রামমোহনের এই যবনোচিত ব্যবহার মেনে নিতে পারে নি তৎকালীন সমাজস্থিত উচ্চবর্ণ তো বটেই সাধারণ মানুষেরাও।

মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মমতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সূত্রে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে সংকীর্ণ ও তীব্র ভেদবৈষম্য মানুষের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু মুসলমান ও খৃষ্টানদের সমবেত সামাজিক উপাসনার দৃশ্য রামমোহনকে সর্বদা মুগ্ধ করত। হিন্দু সমাজে এই সমবেত উপাসনার প্রবর্তন করে ধর্মকে সামাজিক সংহতির মাধ্যমে পরিণত করাই রামোহনের অন্যতম শর্ত ছিল। এক্ষেত্রে মুসলিম ও খ্রীষ্টীয় আর্দশ যে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই।

১২। "কেম্বলকে মা মহারানী কর নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাই গণ, চাইনা গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরযান করগো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।[৪২]

বহুবিবাহ বা কুলীন প্রথা বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য এক জ্বলন্ত অভিশাপ ছিল। প্রাচীনকালে কুলীন প্রথার উৎপত্তি ও প্রসারের জন্য যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি রাজা বল্লাল সেন। প্রবাদ আছে, রাজা বল্লাল সেন ব্রাম্ননদের মধ্যে উপযুক্ত কৌলিন্য বা মর্যাদা দানের জন্য দিন ধার্য করে, ব্রাম্ননদের নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে, রাজসভায় উপস্থিত হতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশ অনুসারে একদল ব্রাম্নণ এক প্রহরের সময়, একদল দেড় প্রহরের সময় এবং আর একদল আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হয়। যারা আড়াই প্রহরের সময় আসে বল্লাল সেন তাদের যথার্থ 'কুলীন' বলে চিহ্নিত করেন। যাঁরা দেড় প্রহরের সময় আসেন তাঁরা শোত্রিয় আর যারা এক প্রহরের সময় আসেন তাঁরা গৌণ কুলীন বলে চিহ্নিত হন। কৌলিন্য মর্যাদায় এইভাবে আমরা পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত কুলীনদের পাই, যেমন - কুলীন, শোত্রিয়, বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী। এই কুলীন এবং তাদের সমাজ স্বীকৃত বহুবিবাহ এমন বিকৃত ও কদর্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে কিছু মানুষ এই প্রথা বিলোপের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' এই বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পুস্তক ক্রমাগত লিখে বিভিন্ন পত্রিকা যেমন 'সোমপ্রকাশ' ইত্যাদিতে প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা যাঁদের অপছন্দ ছিল তারা হলেন মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশালের রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, বারাণসীর যুবক-পন্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ও পন্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ বন্ধ করার পক্ষেও বিদ্যাসাগর পেলেন অনেককে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন "কলকাতা শহর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববঙ্গে ও এসে পৌঁছয় এবং সেখানে ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে কৌলিন্যপ্রথার বিরূদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, ব্রজসুন্দর মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন বংশের ব্রাম্নন-কায়স্থরা এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ঢাকা অঞ্চলের আন্দোলন প্রধানত বিক্রমপুর তারপাশা নিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠে। রাসবিহারীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলনের ব্যাপারে যোগাযোগও ছিল এবং তার আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগের জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্রও হয়েছিলেন।"[৪৩]

বিদ্যাসাগর যাঁর সহায়তা ও আন্তরিকতায় বহুবিবাহ উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন তিনি এই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই সামাজিক সুফলটুকু পাওয়ার জন্য রাসবিহারী মহাশয়কে

১৩। বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে

যে কত সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ' নামক পত্রিকা তার প্রমাণ। "বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকা প্রকাশের গ্রাহক মন্ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহুদোষকের অধিবেদন প্রথার নিরাকরনোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই, তাঁহাকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহুবিবাহের বহুদোষ দ্যোতক পুস্তক ও গান রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতেছেন, অসহনীয় শীতবার্তাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও বহু স্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দরিদ্রতা, পরিবারবর্গের অন্নাচ্ছাদন ঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রুক্ষেপমাত্র করিতেছেন না।" [৪৪]

আশ্চর্যের বিষয় এই - এই সময় কুলীন সমাজের মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিল। 'উনিশ শতকের তিরিশের বছরগুলি থেকে বিধবা বিবাহ নিয়ে সমাজে আলোচনা শুরু হয়। ১৪ মার্চ, ১৮৩৫-এ 'সমাচার দর্পণ-এ শান্তিপুর নিবাসী কয়েকজন অবিবাহিতা প্রৌঢ়া কুলীন কন্যা সম্পাদকের কাছে এক পত্রে তাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করে বাঙলায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরে বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং উপস্ত্রী নিরোধ সম্পর্কে আইন প্রার্থনা করেন। ২১ মার্চ এই পত্রটির দাবীকে সমর্থন করে চুঁচুড়ার কয়েকজন ভদ্রমহিলা 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদককে লেখা এক পত্রে স্ত্রী শিক্ষা, পরপুরুষের সঙ্গে আলাপের ও পতি নির্বাচনে স্বাধীনতা বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, পণপ্রথা বিলোপ ইত্যাদির সঙ্গে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের দাবী জানান।'*

সেই সময় বাংলাদেশের ছোট লাট ছিলেন ক্যাম্পবেল। রাসবিহারীর এই কষ্ট প্রত্যক্ষ করে লোককবিরা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে ছড়াটি রচনা করেন যাতে মহারাণী যেন ক্যাম্পবেলকে এই বহুবিবাহ প্রথা তুলে দিতে আদেশ করেন।

এরপর ১৮৫৫ খৃঃ বিদ্যাসাগর ও বর্ধমানের মহারাজা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইন সভায় আবেদন করেন। অপরদিকে রাধাকান্ত দেব ইহার স্বপক্ষে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। নানা কারণে বহুদিন ইহার আলোচনা বন্ধ থাকে এবং ১৮৬৬ খৃঃ বাংলা গর্ভণমেন্ট এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাঙালি ও ইংরেজ সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। বিদ্যাসাগরের ব্যতীত আর সকল বাঙালি সদস্যই এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেন। সুতরাং গভর্ণমেন্ট এই বিষয়ে আইন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার পর বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে এবং আইনের সাহায্য ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা রহিত হইয়াছে।" [৪৫] কিন্তু বিদ্যাসাগর ও রাসবিহারীর অক্লান্ত চেষ্টায় যে জনমত তৈরী হয়েছিল তারই ফলাফলে যে এই সমাজ পরিবর্তন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৩। বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল।।
কত বাদী প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়ী আদি করি, মাতিয়াছে সব।

রাজা রামমোহনের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হওয়ায় এবং ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় সাধারণ হিন্দুদের মধ্যেও বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৩৭ খ্রীঃ ভারতীয় আইন কমিশন কলকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজের সদর আদালতে বিচারকদের এ বিষয়ে তাদের মতামত চেয়ে পাঠান। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আইন প্রণয়নে কারোরই তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহের চেষ্টা করলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়। প্রায় শতাধিক বৎসর পর আবার কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর রাজা শ্রীশচন্দ্র সেই চেষ্টা করলে একঘরে হওয়ার ভয়ে স্মার্ত পন্ডিতরা এই ব্যবস্থায় রাজী হননি। কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল

বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন একসাথে চেষ্টা করেন, সেই চেষ্টাও সফল হয়নি। পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস তাঁর অল্প বয়সী বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্রে অনেক ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সাক্ষর সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরে সাক্ষরকারীরাই বিরোধিতা করেন। ১৮৪৫ খৃঃ British India Scciety বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ধর্মসভা ও 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সঙ্গে আলোচনা করে; কিন্তু কোন সভাই এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। "এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থনকল্পে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন মাসে (১৮৫৪ খৃঃ) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ফলে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন খুব তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপক্ষ পন্ডিতগণের যুক্তি খন্ডন করিয়া বিধবাদের সমর্থনে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহাতে আন্দোলন সর্বশ্রেণির মধ্যে বিস্তৃত হয়"। [৪৬]

বিদ্যাসাগর এই প্রথার উচ্ছেদ করবার জন্যে শুধু প্রবন্ধ লিখেই কর্ত্তব্য শেষ করেন নি, তিনি তাঁর নিজের পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকে খানাকুল, কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সাথে বিবাহও দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে "এই সংস্কার কর্ম তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, এর জন্য তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন এবং আবশ্যক হলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নন। দেশাচার বলেই যে তার অন্ধ দাসত্ব করতে হবে, একথা তিনি স্বীকার করতেন না। লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয়ে তিনি বিচলিত হননি।" [৪৭]

বিদ্যাসাগর এরপর ১৮৫৫ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর বিভিন্ন স্তরের ৯৮৭ জন হিন্দুর সাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই আবেদন পত্রে বলা হয়েছিল যে, দেশাচার অনুযায়ী হিন্দু বিধবাদের পূর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে এই নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই আবেদনকারীরা মনে করেন যে, শাস্ত্রের অপব্যাখার সাহায্যে এক শ্রেণির নারী যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন অবিলম্বে তা দূর হওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে পুস্তক-পুস্তিকাই শুধু নয়, উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাদ-বিবাদে জমজমাট হয়ে উঠল সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে জোরালো মন্তব্য করেছিল যে পত্রিকাগুলি, তার মধ্যে অন্যতম 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর'। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যিনি প্রাচীনপন্থি বলেই সবিশেষ পরিচিত তিনি অত্যন্ত দ্বিধাহীন ভাষায় সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন - 'পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ঐরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ পূর্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, যেমত কোন তরু রোপণ করিয়া অনবরত যত্নবারি সেচন না করিলে তাহার ফল দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ কোন গুরুতর কার্য সাধন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও পরিশ্রম প্রভৃতির আবশ্যক করে, কঠিনতর কর্মসকল কোনমতেই অনায়াস হইতে পারে না (সংবাদ প্রভাকর ৯.২.১৮৮৫)। বেঙ্গাল স্পেকটেটর লিখল - পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহ কারণে সক্ষম না হয় (২.৪.১৮৪২)। সংবাদ প্রভাকর লিখেছিল - বিজ্ঞ লোকেরা বিধবাদিগের বিবাহের জন্য বারংবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন, বিশেষত শাস্ত্রে আছে বিধবারা বিবাহ করিতে পারেন তথাপি একগুঁয়ে হিন্দুরা শাস্ত্রের অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন না, যুবতী বিধবাদিগকে এমনি রাখিয়া দিবেন, বিধবাদের শরীর কি শরীর নয়, তাহারা কি মহাবল ইন্দ্রিয়দলকে হাত বুলাইয়া শান্ত রাখিবে... (০৮.০৫.১৮৪৯)।

অন্যদিকে গালিগালাজের পথ নিল নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা - "কে কার পিতাকে পিতা বলিবে; তাহার বিন্দুমাত্র বিচার থাকিবেক না, ইচ্ছামতো মৈথুনক্রিয়া চলিবেক অর্থাৎ যারা বেশ্যা লইয়া গুপ্তভাবে জঘন্যভাবে সংসার করিতেছে তাহাহদিগের পরম হিত হইতে পারিবে, কেননা; বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে তাহাদিগের আর জঘন্যতা থাকিবে না; অনায়াসে একঘর গৃহস্থ হইয়া উঠিবে (১৫ পৌষ ১২৬২)।

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী আক্ষেপ করে লিখলেন -

কিছু না থাকিবে বাকি, শুনিতেছি হবে নাকি
বিধবার বিয়ে এই দেশে ।।
মনে মনে ছিল আশা, বৃদ্ধার ভবনে বাসা
পড়ি আর কিছুকাল রব ।।
সকলি হইল সারা বর খুঁজিতেছে তারা
কানে শুনে বিবাহের রব।।

(বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পৃঃ ২৭০)

কিন্তু বিধবাদের নিয়ে সমাজের এই আলোড়নে বিধবারা, বিশেষত অল্প বয়সী বিধবারা যথেষ্ট আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তারই প্রতিফলন ঘটেছিল তৎকালীন সাহিত্যে। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকায় 'বিধবাদ্বয়ের কথোপকথন' শিরোনামে যে লেখাটি প্রকাশিত হল সেখানে এই উল্লাস গোপন থাকে নি -

"কামিনী। বলি দিদি বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছায় কপাল ধল্ল গো ।
কিশোরী । সে কি লো, কপাল ধরা আবার কেমন ?
কামিনী । ওলো, আমাদের আবার বিয়ে হবে।
কিশোরী । না ভাই কেমন করে হবে, পদে পদে শত্রু ।
কামিনী । দিদি তুই যানিস নে, শত্রুর মুখে যে চুন কালি পড়েছে।
কিশোরী। না ভাই, আমি তোর কথায় বিশ্বাস যাই না। ও বাড়ির বড় ঠাকুরের মুখে তক্কালঙ্কার বিপক্ষে কি লিখিয়াছেন তবেই তো সব গেল।
কামিনী । রেখে দে তোর তক্কালঙ্কার , অমন কত তক্কালঙ্কার ওপর চালাকি খাটিয়াছেন তাহাতে সবই করলেন। সাগর হইতে নতুন এক পুস্তক উঠিয়াছে তার ওপরে চালাকি চলবে না।..

বুঝিলাম এতদিনে কপাল খুলিল।
করব না আর একাদশী এবার ঘুচিল।।
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ভেবে দিন রেতে।
সকল ঘুচিল দুখ, ঈশ্বর কৃপাতে।। (অগ্রহায়ণ ১২৬২)

১৮৫৫ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা আইনের খসড়া পেশ করা হলে ভারতের সর্বত্র এই প্রথার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। রাজা রাধাকান্তদেব এই প্রথার পক্ষে প্রায় ৩৭,০০০ লোকের সাক্ষরিত আর একটি পত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান। এছাড়া নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) প্রভৃতি জায়গা থেকেও বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এবং প্রসিদ্ধ পন্ডিতদের পক্ষ থেকে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিধবা বিবাহের সমর্থনেও প্রচুর আবেদন পত্র জমা পড়েছিল। পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক, আন্দোলন বেশ কিছুদিন চলার পর ১৮৫৬ খৃঃ ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইনের অনুমোদন লাভ করে।

বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন সমাজে সর্বস্তরে এমন আলোড়ন ফেলেছিল যে, বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়া সাধারণের মুখে মুখে ফিরত। শান্তিপুরের তাঁতিরা বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়িতে ছড়া লিখে বেশি দামে বিক্রি করত। ছড়াগুলি হল-

১। বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়,
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই ঈশ্বর দিয়েছেন সই,
এবার বুঝি ভাবিস ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই।
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই।"

২। আমাদিগকে দিতে নাগর
এলেন গুণের সাগর বিদ্যাসাগর
বিধবা পার করতে তরির গুণ ধরেছেন গুণনিধি।

ইংরেজ আগমন। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও জমিদার প্রজার সম্পর্কের নতুন সমীকরণ স্থানীয়ভাবেও অনেক লোকছড়ার জন্ম দিয়েছে। যে লোকছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিক রাজনীতির খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। যেমন-

১৪। সরিতুল্লা ম্যাদে গেল, টের পাইল না নানু
আখার উপর ডাল চড়াইয়া পলাইল রামতনু।। [৪৮]

ফরিদপুর জেলার উলপুরের জমিদার বসু চৌধুরীদের সাথে প্রজাদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না। কিন্তু প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে মাঝে মাঝেই বিরোধ উপস্থিত হোত। ১২৬৪ ও ১২৬৫ সালে বাঙলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় সিপাহী বিদ্রোহের জন্য গভর্ণমেন্ট বিচলিত হয়েছিলেন। স্থানীয় অঞ্চলে সেই সব গল্প মুখে মুখে অনেক বেশী রকমে প্রচারিত হয়েছিল। এইসব খবরে উদ্বুদ্ধ প্রজারা মনে করেছিল তারা জোটবদ্ধ হয়ে খাজনা দিতে না চাইলে জমিদার তাদের কিছুই করতে পারবে না। ফলে জমিদারের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রজারা জোটবদ্ধ হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। ১২৬৬ সালে এই জোটের সূত্রপাত। উলপুরের উত্তর ও পূর্ব জোয়ারের প্রজাদের নেতৃত্বে গোপনে ও পরে প্রকাশ্যেই জমিদারের বিরূদ্ধে জোটবদ্ধ হতে লাগল প্রজারা। "ষড়যন্ত্রকারীগণ সাহাপুর পরগণায় উত্তর সীমানাস্থিত কলপুর গ্রামে জোটের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেই গ্রামের আনু উকিলকে (ডাক নাম নানু মিঞা) জোটের নেতৃত্বে বরণ করিল এবং সরিতুল্লা, সর্দার, ভগীরথ বালা, কালীচরণ মন্ডল, রামতনু মন্ডল প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান ও নমঃশূদ্র মাতব্বরকে জোট কমিটির মেম্বার নিযুক্ত করিল। এই সকল মেম্বারগণের অনুগত ও স্বপক্ষীয় প্রজাগণকে ছলে বলে জোটে যোগদান করান, পরগণায় সমস্ত প্রজাদের উপর জোটের খরচ নির্বাহের জন্য চাঁদা বা হার আদায় করা এবং তদ্দারা তাহাদের আবশ্যকীয় লাঠিয়াল প্রভৃতি রাখা। এই সমস্ত চাঁদার টাকা নানু মিঞার কথামত ব্যয়িত হোত এবং জোটের কার্যাদি মুখ্যত তাহারই আদেশ মত পরিচালিত হতো।" [৪৯]

এইসব লোকের নেতৃত্বে প্রজারা প্রথমে জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দেওয়া বন্ধ করে, পরে খাজনা দিতে না হওয়ার প্রলোভনে আরও অনেক প্রজা যুক্ত হওয়ায় বিদ্রোহীদের সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তারা জমিদারের ধানের গোলাগুলি লুঠ করে, পরে নানু মিঞাই তাদের জমিদার বা নেতা এইরকম ঘোষণা করে। এরপর তাদের বিরূদ্ধচারী কিছু লোককে তারা হত্যাও করে। এরই মধ্যে একজন বটকৃষ্ণ মিশ্র বিদ্রোহীদের দ্বারা জখম হয়ে প্রাণত্যাগ করলে জমিদাররাও যেমন তাদের লাঠিয়াল ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয় তেমনি এই হত্যাকান্ডের জন্য জেলা সদর থেকে পুলিশ আসে তদন্তের জন্য। পুলিশ আসার খবর চারিদিকে রটে যাওয়ায় জোটের প্রধান নায়ক নানুমিঞা ও ভগীরথ বালা দেশ ছেড়ে পলাতক হলেন। ধরা পড়লেন সরিতুল্লা সর্দার সহ আরও অনেকজন। বিচারে সরিতুল্লা সহ ১৭ জনের দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদন্ড এবং অন্যান্যদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হলো। যে সব প্রজারা এই বিদ্রোহে ইন্ধন দিয়েছিলেন তারা জমিদারের বশ্যতা স্বীকার করে থেকে গেলেন। এইভাবে ১২৭০ সালের জোটের অবসান হয়েছিল।

আর একটি লোকছড়ায় ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগজনিত দুঃখ বোধ প্রতিফলিত হয়েছে -

১৫। আল্লায় বানাইছে সাধের
হিন্দু মুসলমান
দ্বারিক বাবু সৃষ্টি করছে
পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতা পূর্ব অবিভক্ত বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারগত কিছু প্রভেদ থাকলেও জাতিগত কোন বিভেদ ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ অতি সংগোপনে এবং সযত্নে ইংরেজজাতি বপন করেছে ধীরে ধীরে। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী বিশেষত বাঙলাদেশের সর্বত্র যখন ইংরেজ বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে তখন ইংরেজ জাতি তাদের প্রিয় দেশ বিভাজনের খেলাটি খেলে। বলা হল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই দেশভাগ। দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী জেনে হিন্দু ও মুসলমান উভয়পক্ষই নিজেদের লাভের অংশটুকু বাড়িয়ে নিতে চাইল। এই ব্যাপারে হিন্দুরা যেমন দেশভাগের কারণ হিসাবে মুসলীম লীগকে দায়ী করে থাকে, মুসলীমরাও তেমনি পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য সাদারিপুরের তফশিলী নেতা দ্বারকানাথ বারুরীকেই দায়ী করে থাকে। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস থেকে দ্বারকানাথ বারুরীকে বহিষ্কার করা হলে তিনি তফশিলী ফেডারশনে যোগ দেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলীম লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেছেন তিনি। সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভায় তিনি পূর্ত গৃহ নির্মাণ মন্ত্রী ছিলেন। ক্ষমতালোভী এইসব মানুষদের জন্যই ইংরেজদের পক্ষে এই বিপুল সম্ভাবনাময় ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ একটি দেশকে দুটুকরো করে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

রাজনীতির এই ইতিহাস যা কখনও সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বা কখনও আঞ্চলিকভাবে বেঁচেছিল। আঞ্চলিক রাজনীতি কখনও নিয়ন্ত্রণ করত বৃহত্তর রাজনীতিকে, আবার দেশভিত্তিক রাজনীতির চালচিত্রটাও কখনও কখনও বদলে যেত অঞ্চলের সীমানায় এসে। এইভাবেই পুষ্ট হয়ে উঠেছে বয়ে চলা রাজনীতির ইতিহাস ।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. মিত্র সুবল চন্দ্র, সরল বাঙলা অভিধান, পৃঃ ২৪৩

২. দাশগুপ্ত অশীন, ইতিহাস ও সাহিত্য, পৃঃ ১২

৩. ঘোষ বিনয়, ইতিহাস রাজনীতি ও লোকসংস্কৃতি পৃঃ ৩০-৩১

৪. দাশগুপ্ত অশীন, ইতিহাস ও সাহিত্য, পৃঃ ১২

৫. রায় শ্রী নিখিলনাথ, মুর্শিদাবাদ কাহিনি, সম্পাদনা : কমল চৌধুরী, পৃঃ ৩৪৭

৬. মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৮

৭. মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার, প্রাক্-পলাশী বাংলা, পৃঃ ১২৩

৮. Alibardi Khan, Kalikinkar Dutta, P - 444

৯. Marathas in Bengal History of Bengal, P - 455

১০. আহমেদ ওয়াকিল, বাঙলার লোকসাহিত্য ছড়া, পৃঃ ২৭

১১. ঘোষ বিনয়, বাদশাহী আমল, পৃঃ ৬৬-৬৭

১২ আলি সেলিম, সাধারণ পাখি, পৃঃ ৬৫

১৩. চক্রবর্তী মহিমা নিরঞ্জন, বীরভূম বিচরণ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪

১৪. সরকার বিহারী লাল, বঙ্গে বর্গী, পৃঃ ৭২-৭৫

১৫. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, সংকলন ও সম্পাদনা - কমল চৌধুরী, পৃঃ ৩৫২

১৬. চৌধুরী কমল, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃঃ ১৫৯

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাঙলার ইতিহাস, নবাবী আমল, পৃঃ ১৮৩

১৮. মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৭১ (২য় খন্ড)

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাঙলার ইতিহাস, নবাবী আমল, পৃঃ ১৮৪

২০. বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাঙলার ইতিহাস, নবাবী আমল, পৃঃ ১৮৭

২১. বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাঙলার ইতিহাস, পৃঃ১৮৮

২২. বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাঙলার ইতিহাস, পৃঃ১৮৯

২৩. মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ১৭৩

২৪. চৌধুরী কমল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ২৪৪

২৫. মুর্শিদবাদের ইতিহাস, সম্পাদনা : কমল চৌধুরী, পৃঃ ২৩৪

২৬. শাসমল রবীন্দ্রনাথ , ছড়ায় ঐতিহাসিক উপাদান, পৃঃ ১১৪, (বাংলার ছড়া, ছড়ার বাংলা, সম্পাদনা - সৌগত চট্টোপাধ্যায়)

২৭. মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড,পৃঃ৩৩

২৮. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, পৃঃ ৬৬৪ (সাহিত্য সংসদ)

২৯. রায় রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃঃ ১৭২

৩০. রায় রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃঃ ১৫২

৩১. মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার , রানি ভবানী, পৃঃ ১৪৮

৩২. রায় রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃঃ ২৬২-২৬৩

৩৩. চৌধুরী কমল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ২৭৭-৭৮

৩৪. চৌধুরী কমল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ২৭৮

৩৫. চৌধুরী কমল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ২৭৮

৩৬. Impeachment of Warren Hasstings, Vol. 1, P 423

৩৭. শাস্ত্রী শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ৪৩

৩৮. শাস্ত্রী শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ৩৯

৩৯. শাস্ত্রী শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৪১-৪২

৪০. বিশ্বাস দিলীপ কুমার , রামমোহন সমীক্ষা, পৃঃ ৩৪৬-৪৭

৪১. বিশ্বাস দিলীপ কুমার , রামমোহন সমীক্ষা, পৃঃ ৩৭০

৪২. দত্ত রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫০ (ঢাকার বনগ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্তীর রচিত ছড়া)

৪৩. ঘোষ বিনয়, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ২৯২

৪৪. ঢাকা প্রকাশ, ১২৮১ সাল, ৪ সংখ্যা

* বসু স্বপন, বাঙলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃঃ ১৩২-১৩৩

৪৫. মজুমদার রমেশচন্দ্র , বাঙলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ৩৫০

৪৬. মজুমদার রমেশচন্দ্র , বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ ৩৪৪

৪৭. ঘোষ বিনয় , বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ২৪০

৪৮. রায় আনন্দনাথ, ফরিদপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৪১৪

৪৯. রায় আনন্দনাথ, ফরিদপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৫১১